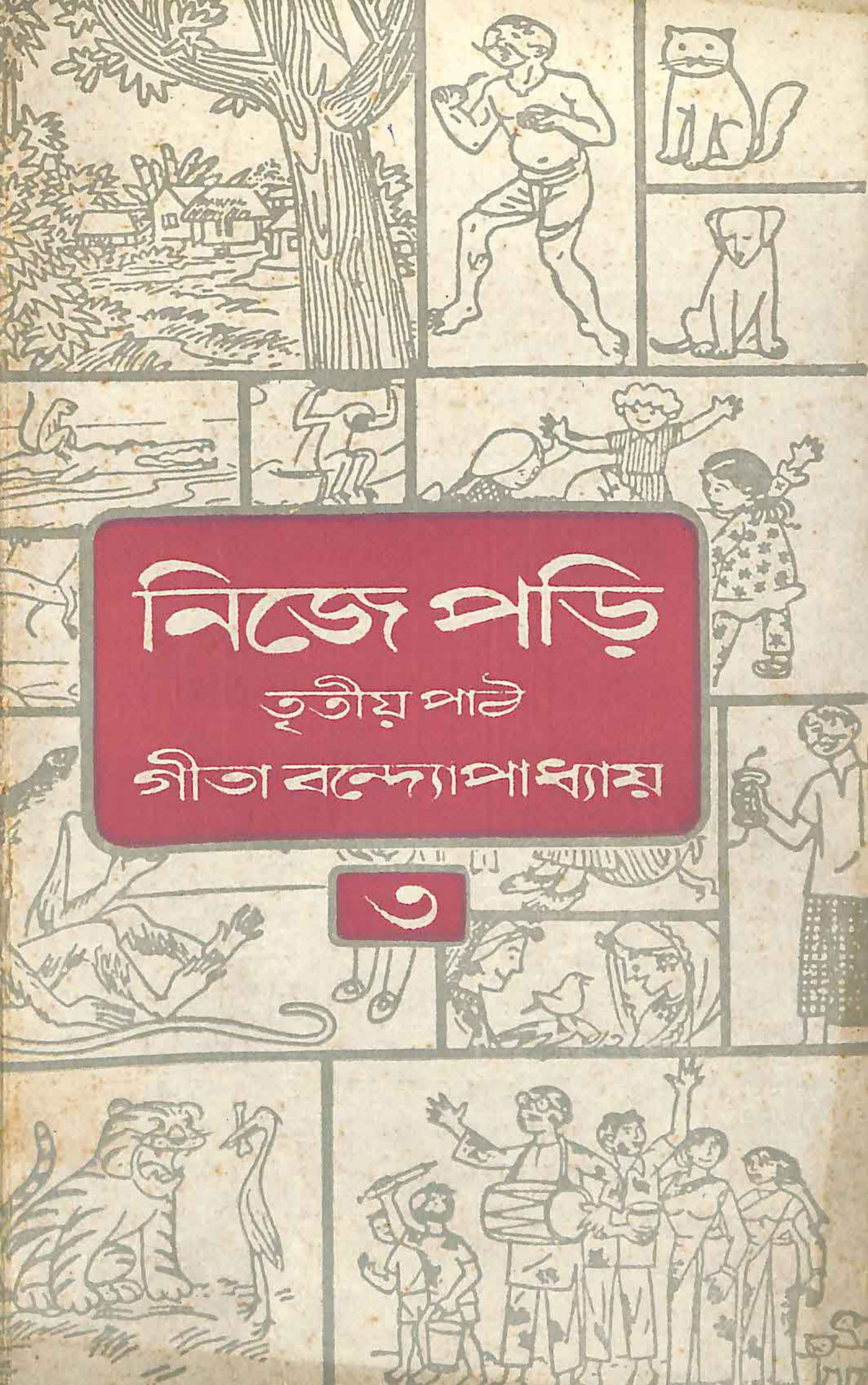


নিজে পড়ি

তৃতীয় পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

কিছু কথা

তৃতীয় শ্রেণীতে যারা পড়ে, তারা লিখতে পড়তে শিখেছে। এখন যাতে তারা আজকের লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেইভাবেই পাঠমালাটি সাজানো হয়েছে।

ভাষা বরাবর একরকম থাকে না। আগে যে ভাষায় বাংলা লেখা হত, এখন ঠিক সে-ভাষায় লেখা হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষার একটা ধারাবাহিকতা আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাষায় বাংলা লিখতেন, তারই উত্তরাধিকারী আজকের বাংলা ভাষা। এই বইতে ইচ্ছে ক'রেই বাংলা ভাষার চলিত রূপের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। নিচের দিকে একবার বাংলা ভাষার চলিত রূপ আয়ত্তে এলে উঁচুর দিকে আগেকার লেখকদের রচনা পড়া ও বোঝা সুবিধে হবে।

আমার মনে হয় ছোট বয়সে পরিচিত এবং কথা বলার ভাষার ওপর প্রীতি জমানো সহজ। এর ফলে ভাষা সম্পর্কে ছোটদের একটা আত্ম-বিশ্বাস জাগে। ভাষার ওপর দখল আনতে এই পদ্ধতি আমার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে সহায়ক বলে আমার মনে হয়েছে।

এমন লেখকের লেখা এই পাঠমালায় দেওয়া হয়েছে যাঁদের অনেকের নাম তারা প্রায়ই বড়দের কাছে শোনে। ফলে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গোড়াতেই তাদের একটা যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারবে। তাছাড়া এখনকার ভাষায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাও এর ফলে অর্জন করা সহজ হবে।

এই বইয়ের অনুশীলনীগুলো দেওয়া হল খানিকটা দৃষ্টান্ত হিসাবে। শিক্ষকেরা প্রয়োজনমত এর অদলবদল করতে পারবেন। বইয়ের শেষে এই বইতে লেখকদের ব্যবহৃত শব্দাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হল। এতে শিক্ষার্থীদের অভিধান দেখার অভ্যাস তৈরি হবে।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজে পড়ি

৩

তৃতীয় পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট লংম্যান

রেজিস্টার্ড অফিস
৩/৬/২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস
কামানী মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৩/৬/২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০ ০০৪
এস্ সি গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১
'পাতিয়ালা হাউস', ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্মৌ ২২৬ ০০১

ISBN 0 86131 503 0

চিত্রশিল্পী ও প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪
পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯০

প্রকাশক ঃ
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রাকর ঃ
জয়শ্রী প্রিন্টার্স
৩২ ওয়েস্টন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

সূচীপত্র

হিতোপদেশের গল্প

রাজশেখর বসু



গোদাবরী নদীর তীরে একটি প্রকাণ্ড শিমূল গাছ আছে, চারিদিক থেকে পাখিরা এসে রাত্রিতে সেই গাছে বসে ঘুমায়। লঘুপতনক নামে একটি কাক সেই গাছে থাকত। একদিন খুব ভোরে চাঁদ অস্ত গেলে কাকের ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল, যমের মত ভীষণ এক ব্যাধ নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাক মনে করল, 'জানি না আজ কী বিপদ হবে।' এই ভেবে সে ব্যাধের পিছনে পিছনে উড়ে চলল।

ব্যাধ এক জায়গায় মাঠের উপর কিছু চাল ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর জাল বিছিয়ে দিল। সেই শিমুল গাছে অনেক পায়রা থাকত, তাদের রাজার নাম চিত্রগ্রীব। পায়রার দল চাল খেতে যাচ্ছে দেখে চিত্রগ্রীব বলল, 'ব্যস্ত হ'য়ো না, এই নির্জন বনে চাল কোথা থেকে এল, আগে তার খোঁজ নাও। যদি হঠাৎ কিছু করতে যাও তো বিপদে পড়বে।'

একটি লোভী পায়রা বলল, 'আঃ, কি বাজে কথা বলছ ?

'বিপদ হলে বুড়োর কথা মানবে মাথা পেতে ;
সকল সময় শুনতে গেলে পাবে না আর খেতে ॥'

এই কথা শুনে সমস্ত পায়রা ঝুপ ক'রে মাঠে নেমে চাল খেতে লাগল, এবং সকলেরই পা জালে আটকে গেল। তখন পায়রারা বলল, 'ওই লোভী হতভাগাটার কথা শুনে আমাদের এই বিপদ হল।'

চিত্রগ্রীব বলল, 'এখন ওকে গাল দিয়ে কি হবে, যাতে বিপদ থেকে উদ্ধার পাও সেই চেষ্টা করো। সকলে একসঙ্গে জাল নিয়ে উড়ে চলো।'

পায়রার দল জাল নিয়ে আকাশে উঠল। ব্যাধ ভাবল, 'এরা যখন মাটিতে নামবে তখন সব কটাকে ধরব।' ব্যাধ অনেক দূর পায়রাদের সঙ্গে চলল, যখন আর তাদের দেখা গেল না তখন সে মনের দুঃখে বাড়িতে ফিরে গেল।

উড়তে উড়তে পায়রারা বলল, 'এখন কি করা উচিত?' চিত্রগ্রীব বলল, 'আমার একটি ইঁদুর বন্ধু আছেন, তাঁর নাম হিরণ্যক, তিনি গণ্ডকী নদীর ধারে থাকেন। তাঁর কাছে চলো, তিনি এই জাল কেটে আমাদের মুক্তি দেবেন।'

হিরণ্যক গণ্ডকী নদীর ধারে একটি গর্তের ভিতর থাকত। গর্তে ঢোকবার জন্য চারদিকে একশটি পথ ছিল, বিপদ দেখলেই হিরণ্যক যে-কোনও একটি পথ দিয়ে গর্তে চলে যেত। পায়রার দল নদীর ধারে নামলে হিরণ্যক ভয় পেয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে চুপ ক'রে রইল।

চিত্রগ্রীব বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক, তুমি কথা বলছ না কেন?' ইঁদুর তখন বেরিয়ে এসে বলল, 'কী সৌভাগ্য, আমার বন্ধু চিত্রগ্রাব এসেছেন। তোমাদের এই বিপদ কি ক'রে হল?' এই ব'লে ইঁদুর তাড়াতাড়ি চিত্রগ্রীবের পায়ের কাছে জাল কাটতে গেল।

চিত্রগ্রীব বলল, 'বন্ধু, থামো থামো ; আগে আমার সঙ্গীদের জাল কেটে মুক্তি দাও, তারপর আমার জাল কেটো।' ইঁদুর বলল, 'আমি দুর্বল, আমার দাঁতও শক্ত নয়। যতক্ষণ আমার দাঁত না ভাঙে ততক্ষণ তোমার জাল কাটব, যতটা পারি অন্য পায়রাদের জাল কাটব।'

চিত্রগ্রীব বলল, 'তা হতে পারে না, এই পায়রার দল আমার আশ্রয়ে আছে, আগে এদের মুক্তি দাও।' হিরণ্যক বলল, 'বাহবা, বাহবা বন্ধু, শুধু এই পায়রাদের নয়, তুমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকের রাজা হবার যোগ্য।' এই ব'লে হিরণ্যক তার দাঁত দিয়ে জাল কেটে ফেলে সমস্ত পায়রাদের মুক্তি দিল।

অনুশীলনী

১। বইয়ের শেষে 'আমাদের অভিধান' দেখে মানে শেখো :

যমের মত, ব্যাধ, লোভী, উদ্ধার, স্বর্গ, মর্ত্য, ত্রিলোক, যোগ্য।

২। ব্যাধকে দেখে কাক কি করল ?

৩। পায়রাদের রাজা চিত্রগ্রীব কেন নির্জন জায়গায় চাল পড়ে থাকতে দেখে তা পায়রাদের খেতে বারণ করল ?

৪। চিত্রগ্রীবের কথা না মেনে চলায় পায়রাদের কি অবস্থা হল ?

৫। গণ্ডকী নদীর তীরে ইঁদুররাজ হিরণ্যক কেন চিত্রগ্রীবকে বাহবা দিল ?

৬। এই গল্পটা থেকে তুমি কি শিখলে ?

৭। এই গল্প থেকে 'অ' এবং 'আ' দিয়ে আরম্ভ যে-শব্দগুলি, তার একটি তালিকা করো এবং সেগুলির মানে লেখো।

৮। বাক্য তৈরি করো :

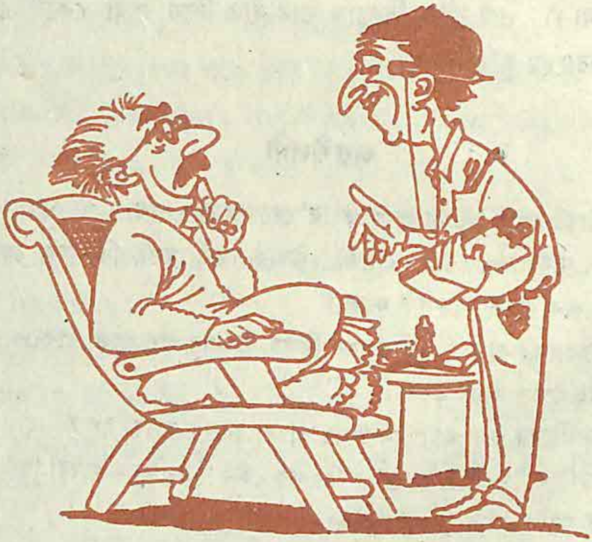
তীরে, প্রকাণ্ড, ভীষণ, চারদিকে, বিপদ, সমস্ত।

৯। এক কথায় লেখো :

সেখানে জনমানব নেই ; যার ভাগ্য খারাপ ; যার গলায় চিত্র আঁকা ; সোনার মতো যাঁর রঙ ; যারা সঙ্গে থাকে ; যার দেহে বল নেই।

কিছু চাই

সুকুমার রায়



কারোর কিছু চাই গো চাই ?
এই যে খোকা, কি নেবে ভাই
জলছবি আর লাট্টু, লাটাই
কেক, বিস্কুট, লাল দেশলাই
খেলনা, বাঁশি কিংবা ঘুড়ি
লেড্ পেনসিল, রবার, ছুরি ?
এসব আমার বাক্সে নাই—
কারোর কিছু চাই গো চাই ?
কারোর কিছু চাই গো চাই ?
বৌমা, কি চাও শুনতে পাই ?

ছিটের কাপড়, চিকন লেস্
ফ্যান্সি জিনিস, ছুঁচের কেস্
আলতা, সিঁদুর, কুন্তলীন
কাঁচের চুড়ি, বোতাম, পিন্ ?
আমার কাছে ওসব নাই—
কারোর কিছু চাই গো চাই ?

কারোর কিছু চাই গো চাই ?
আপনি কি চান, কর্তামশাই ?
পকেট বই কি খেলার তাস
চুলের কলপ, জুতোর ব্রাশ্
কলম, কালি, গঁদের তুলি
নস্যি, চুরুট, স্ফূর্তি গুলি ?
ওসব আমার কিছুই নাই—
কারোর কিছু চাই গো চাই ?

অনুশীলনী

১। পাঁচটা জিনিসের নাম করো যা তোমার চাই।

২। কর্তামশাই কি কি চাইতে পারেন ?

৩। এই কবিতায় 'ক' দিয়ে আরম্ভ যে শব্দগুলি আছে, সেগুলির একটি তালিকা করো।

৪। নিচের শব্দগুলির মিল দিয়ে শব্দ লেখো :

লাল, আমার, কাপড়, পকেট, কলম, কিছু।

উপদ্রব

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর



আজ নবমী পুজোয় পাড়ার মল্লিকবাবুদের বাড়িতে ভয়ানক ধুম ! বোমা, তুদমা, ঢাক, ঢোল, সানাই আর তিন দল ইংরেজি বাজনার বেজায় আওয়াজে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না।

রাত একটা কি দেড়টার পর বেশ একটু তন্দ্রা আসছিল। এমন সময় আমার কানের কাছে কে বলল, 'কি ভায়া, আমায় চিনতে পার ?'

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি, আমাদের চৌতলার ছাতের বুড়ো ভোঁদড় খুব জমকালো মখমলের সাজগোজ পরে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকছে।

অনেকদিন পরে তাকে দেখে বড় খুশি হলাম। একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভোঁদড় দাদা, এত রাত্তিরে সাজগোজ ক'রে কোথায় চলেছ ? মল্লিকবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল বুঝি ?'

বুড়ো সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, 'ভায়া, তুমি তো বেশ জানো, তোমার ঠাকুরদাদার আমল থেকে আমরা তোমাদের চৌতলার

ছাতের একটা ভাঙা পিল্‌পের ভিতর ঘরদোর বানিয়ে এতকাল নিরাপদে বাস ক'রে আসছি। কিন্তু আজ সেখানে যা ব্যাপার হয়েছে, তাতে ছেলেপিলে নিয়ে ওখানে আর থাকতে সাহস হয় না। তাই অসময়ে তোমার ঘুম ভাঙাতে হল।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারখানা কি ? শিগগির খুলে বলো শুনি।'

বুড়ো বলতে লাগল, 'রাত বারোটায় আহারাদি ক'রে আমার তাল-বেতাল-সিদ্ধ লাঠি ঘাড়ে বাড়ির আল্‌সের চারদিকে আজও বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড কালো বেড়ালের মতো জানোয়ার তোমাদের আঁতুড় ঘর থেকে একটি কচি ছেলে চুরি ক'রে পালাচ্ছে। এই দেখে আমি লাঠি ঘুরিয়ে হা-রে-রে-রে ক'রে হাঁকডাক ছেড়ে ছুটে গিয়ে যেমন তার পিঠে সজোরে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়েছি, অমনি সে খোকাকে টপ্‌ ক'রে আল্‌সেতে ফেলে দিয়ে টিকটিকির রূপ ধরে সড়সড় ক'রে ছাতে উঠে গেল।

'তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তার মায়ের কাছে শুইয়ে রেখে এক লাফ মেরে ছাতে গিয়ে দেখি আমার ছেলে নিচুয়া চিৎকার ক'রে বলছে, "বাবা অন্ধকারে তুমি এই জানোয়ারকে চিনতে পারনি ? ও আমাদের চিরকালের শত্রু। সেই চুটুপাল বনের দু মুখো রাক্ষস, এখন বেড়ালের রূপ ধরে শহরে উৎপাত করতে এসেছে।"

'নিচুয়ার কথা শুনে রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি আমার লাঠির কানে কানে বললাম, "লাঠিভায়া, দুষ্টু রাক্ষসকে একবার তোমার তাল-বেতালি কারদানিটা বেশ ভালো ক'রে দেখিয়ে চট্‌ ক'রে আমার হাতে ফিরে এস।" লাঠি অমনি আমার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে দু-চারটে ডিগবাজি খেয়ে তাল ঠুকে রাক্ষসের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিচুয়াকে এক ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে যেমনি রাক্ষসের চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল, অমনি তার মাথা দিয়ে লাল-নীল-সবুজ রঙের আগুন দপদপিয়ে জ্বলে উঠল। রাক্ষসের চারদিকে একটা আগুনের বেড়াজাল সৃষ্টি ক'রে তার পালাবার

পথ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে সে রাক্ষসকে নাস্তানাবুদ ক'রে তুলল!

'আর খানিকটা সময় পেলে রাক্ষসকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে আকাশে উড়িয়ে দিত। কিন্তু ঠিক সেই সময় হল কি, দৈবাৎ লাঠির গায়ে গায়ে একগাছা ঘুড়ির সুতো জড়িয়ে গেল। বেচারা ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছাতের মাঝে উল্টে পড়ে চিৎকার করতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়ানো সুতো খুলে দিচ্ছি, এই সুযোগে রাক্ষস নিচুয়াকে বগল-দাবা ক'রে এক লাফ মেরে তোমাদের তেঁতুলগাছের উপর পড়ল— তারপর সেখান থেকে বিকট রকম চিৎকার ক'রে হাসতে-হাসতে আরেক লাফে গঙ্গা পার হয়ে কোন্ দিকে যে চলে গেল— আমি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, তাকে আর ধরতে পারলাম না।'

ভোঁদড় দাদার কথা শুনে আমি বললাম, 'কী সর্বনাশ! এত বড় কলকাতা শহরের ভিতর রাক্ষসের উপদ্রব? এ রকম কথা আগে তো কখনো শোনা যায়নি। এখুনি টেলিফোনে পুলিশের বড় সাহেবকে একটা খবর দিলে হয় না?'

অনুশীলনী

১। এসব জিনিস চেনো — বোমা, তুদমা, ঢাক, ঢোল?

২। বুড়ো ভোঁদড় মখমলের জামা পরে নিজেদের সম্পর্কে কি বলল?

৩। বুড়ো ভোঁদড় হা-রে-রে-রে ক'রে কাকে তাড়া করল? কেন?

৪। খোকাকে ফেলে দিয়ে বেড়ালের মতো জানোয়ারটা কিসের রূপ ধরল?

৫। এরা কারা—

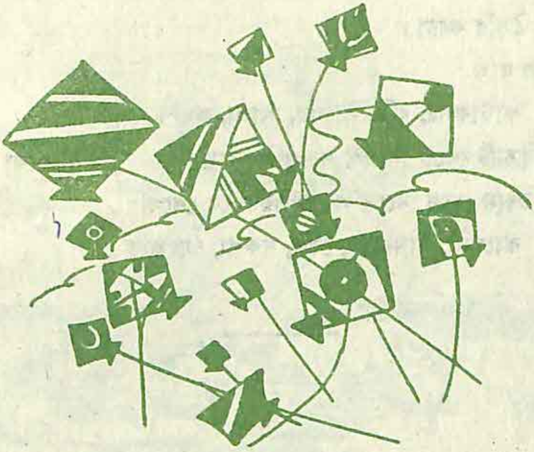
নিচুয়া, চুটুপালু, বনের দু'মুখো রাক্ষস, তাল-বেতাল-সিদ্ধ-লাঠি-ভায়া।

৬। বাক্য রচনা করো:

ধড়মড়িয়ে, চৌতলার ছাত, আলসে, হাঁকডাক, উৎপাত।

ছড়া কাটার ছড়া

অজিত দত্ত



ঘুড়ি-কাটাকাটি এক মজাদার খেলা
কথা-কাটাকাটি হলে বড়ই ঝামেলা।
বর্ষাটা কেটে গিয়ে পুজো এলে বাঁচি,
ছুটিটা কাটাতে যাব চুনার কি রাঁচি।
ক্লাস কেটে দিন যদি ঘুমিয়ে কাটাবে
ফেল হলে একেবারে মাথা কাটা যাবে।
হাত কাটা জামা গায়ে বাঁকা টেরি কেটে
আমাদের পাশ কেটে কে চলেছে হেঁটে ?
লোকটি সাঁতার কাটে রোজ কাটা খালে
আশা রাখে নামজাদা হবে কোনো কালে।
বলটা কাটিয়ে নিয়ে পাকা খেলোয়াড়
গোল দিয়ে এল দেখো কি চমৎকার!
কত যে নক্‌শা কাটা জামা আর শাড়ি,
জল কেটে জাহাজেরা দূরে দেয় পাড়ি।

অনুশীলনী

১। প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলো।

২। 'কাটা' কথাটা আমরা নানা ভাবে ব্যবহার করি। 'কাটা' কথা দিয়ে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

৩। মিল দাও :

কাটাকাটি, যদি, সাঁতার, আশা, জমা।

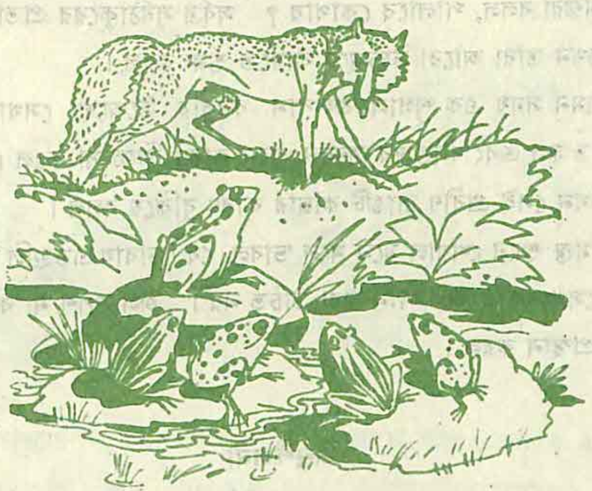
৪। কবিতাটি থেকে বিদেশী শব্দগুলি বেছে নিয়ে তালিকা করো।

৫। অভিধান দেখে নিচের শব্দগুলির মানে শেখো :

ঝামেলা, নামজাদা, কেল, নকশা, চমৎকার।

ভেক ও শৃগাল

প্রমথনাথ বিশী



এক ডোবায় অনেক ব্যাঙ বাস করত। পাশের এক ডোবা থেকে এক প্রবীণ ব্যাঙ সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, ভাই সকল, এবার আমাদের সর্বনাশ হতে চলল, আর কাউকে বেঁচে থাকতে হবে না।

সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে শুধাল, কি হয়েছে খুলে বলো।

তখন আগন্তুক ব্যাঙটি বলল, বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি শীঘ্রই সূর্যঠাকুরের বিয়ে। তারপর ব্যাখ্যা ক'রে বলে, একা সূর্যঠাকুরের প্রতাপেই আমরা অস্থির, গ্রীষ্মকালে বিল খাল ডোবা শুকিয়ে যায়, কোনরকমে প্রাণ রক্ষা করি। এরপর সূর্যঠাকুরের ছেলেমেয়ে হলে তাদের সকলের প্রতাপে পৃথিবীতে কোথাও আর এতটুকু জল থাকবে না, তখন আমাদের মৃত্যু ছাড়া গতি থাকবে না।

তার কথা শুনে ডোবার ব্যাঙদের মুখ শুকিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারো কথা বলবার শক্তি থাকল না।

তারপর প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সকলে একসঙ্গে হায় হায় শব্দে

কেঁদে উঠল ঃ এবার আমরা সবংশে মারা গেলাম। কেউ আর আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

একজন পরামর্শ দিল, চলো, আমরা পালাই।

অন্যরা বলল, পালাবে কোথায় ? সর্বত্র সূর্যঠাকুরের প্রতাপ।

তখন তারা আরো উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করল।

এমন সময় এক শৃগাল জলপান করবার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং ব্যাঙদের ক্রন্দন শুনে কারণ জিজ্ঞাসা করল।

তখন সেই প্রবীণ ব্যাঙটি কান্নার কারণ বুঝিয়ে বলল।

সমস্ত শুনে শেয়াল মনে মনে ভাবল, যে ডোবায় এতগুলি নির্বোধের বাস সেখানকার জল পান করা উচিত নয়। জল স্পর্শ না ক'রেই সে তখন প্রস্থান করল।

অনুশীলনী

১। ভেক ও শৃগালের গল্পটি মুখে বলো।

২। ডোবার প্রবীণ ব্যাঙ সকলকে কি খবর শোনালো ?

৩। প্রবীণ ব্যাঙের কথায় ডোবার অন্য ব্যাঙরা হায় হায় ক'রে কেঁদে উঠে কি বলল ?

৪। শেয়ালকে প্রবীণ ব্যাঙ যখন তাদের কান্নার কারণ জানাল, তখন শেয়াল সে ডোবার জল স্পর্শ না ক'রে চলে গেল কেন ?

৫। মানে লেখো :

প্রবীণ, সর্বনাশ, বিশ্বস্তসূত্রে, ব্যাখ্যা, প্রতাপ, উচ্চস্বরে, উদ্দেশ্যে, ক্রন্দন, নির্বোধ, প্রস্থান।

৬। বাক্য রচনা করো :

গ্রীষ্মকাল, সূর্যঠাকুর, মৃত্যু, বিস্ময়, রক্ষা।

লাল কালো

গিরীন্দ্রশেখর বসু



ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে যে ডোবা আছে, তার একদিকে কালো পিপীলিদের রাজ্য, আর একদিকে লাল পিঁপড়েদের রাজত্ব। দুই রাজত্বে বিশেষ বনিবনাও নেই। কালো পিঁপড়েদের মধ্যে প্রায়ই খুঁটিনাটি নিয়ে মারামারি হয়।

আজ বড়ই গুমোট করেছে, পিপীলিদের কালো বউ ডোবার ধারে জল নিতে এসেছে। কালো বউয়ের রূপের গরবে মাটিতে পা পড়ে না। তার ওপর সে কালো রানীর পেয়ারের সখী। এ ঘাটে যখন কালো বউ জল ভরছে, ডোবার ওপারে লাল পিঁপড়েদের একদল পল্টন কুচকাওয়াজ করতে এল। পল্টনদের দলের এক ডেঁপো ছোকরা কালো বউকে দেখে সুড়সুড় ক'রে এপারে এগিয়ে এসে হাতমুখ নেড়ে কালো বউয়ের উদ্দেশে ঠাট্টা-তামাশা জুড়ল। কালো বউ রেগে ঘাড় বেঁকিয়ে, ঘাট থেকে উঠে এসে গালাগালি দিতে দিতে বাড়ির দিকে চলল। লাল ডেঁপো গান ধরল,

'কালো বউ কালো কোলো,
জলে ঢেউ সামলে চ'লো।'

কালো বউ একেবারে হন্ হন্ ক'রে রানীর কাছে উপস্থিত হয়ে আছড়ে পড়ল। 'কি হল, কি কি হল' বলে রানী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'রাঙামুখো বজ্জাত করে অপমান
গরল ভখিব আমি তেজিব পরান!'

রানী সব কথা শুনলেন। 'এক্ষুনি এর প্রতিকার করব। সখী, আমরুল পাতা আর বেলকাঁটা নিয়ে আয়। আমি রাজাকে লিপি পাঠাই।'

অনুশীলনী

১। লাল আর কালো পিঁপড়েদের আলাদা দু'টি রাজ্য এঁকে তাদের ধরন-ধারণের ওপর গোটা পাঁচেক বাক্য তৈরি করো।

২। ঘোষেদের পুরনো ভিটের ধারে কাদের রাজত্ব ছিল?

৩। কালো বউ যখন খুব কায়দা ক'রে জল তুলতে গেল, তখন লাল পিঁপড়েদের পল্টনরা কি করছিল?

৪। কালো বউকে লাল পল্টনদের ডেঁপো ছোকরা ছড়া কেটে কি বলেছিল।

৫। মুখে মুখে উত্তর দাও:

(ক) কালো বউ হন্ হন্ ক'রে রানীর কাছে উপস্থিত হয়ে কি বলেছিল?

(খ) রানী সব কথা শুনে কি বললেন?

৬। মানে শেখো:

রাজত্ব, গুমোট, গরবে, কুচকাওয়াজ, ডেঁপো, তামাশা, গরল, ভখিব, তেজিব।

৭। বাক্য রচনা করো:

বনিবনা, খুঁটিনাটি, মারামারি, ঠাট্টা-তামাশা, আছড়ে।

জাতির পাঁতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
সেই দিন মহামানব-ধর্মে
মনুর ধর্ম বিলীন হবে।

অনুশীলনী

১। মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদের নমুনা দাও।

২। লেখো: ক্ষুদ্র, ব্রহ্মময়, প্রকট, কৃত্রিম।

৩। মিল দাও: যবে ——। জাতি ——। লোটে ——।

সেই লোকটা

পুণ্যলতা চক্রবর্তী



সেই লোকটাকে দেখলেই খোকনের ভয় হয়— বেঁটে, মোটা, কালো, ঝাঁকড়া-মাথা, পিঠে মস্ত একটা থলে। আয়া বলেছে, 'লোকটা ছেলেধরা। একলা বাইরে গেলেই, ধরে ঝুলিতে পুরবে!' তাই তো খোকন কখনো একলা রাস্তায় বেরোয় না।

একদিন সে ভুলে বাঁদর-নাচওয়ালার পিছনে পিছনে অনেক দূর চলে গেল। বাড়ি ফিরতে গিয়ে আর পথ চিনতে পারে না! ভ্যাঁ—ক'রে সে কেঁদে ফেলল।

হেঁড়ে গলায় কে বলল, 'কি হল, খোকাবাবু ?' চেয়ে দেখে, ওরে বাবা ! সেই লোকটা ! 'মা—মা' বলে খোকন ছুটল, লোকটা খপ ক'রে তাকে ধরে কাঁধে তুলে বলল, 'ভয় কি ? এখনি মার কাছে যাবে, কোথায় বাড়ি তোমার ?' কোথায়, তা জানে না বলেই খোকন কাঁদছে।

ঘুরতে ঘুরতে, হঠাৎ তারা বাড়ির সামনে এসে পড়ল। বাড়িতে তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে খোকনকে খুঁজছে !

বাবা বকশিশ দিতেই, লোকটা একগাল হেসে সেলাম করল, তারপর আবার থলি কাঁধে চলল—'শি-শি বো-ত-ল !'

খোকন চুপি চুপি মাকে বলল, 'মা, তবে যে আয়া বলেছিল, লোকটা ছেলেধরা ?'

'না, বাবা, লোকটি খুব ভালো। কিন্তু, যদি সত্যিই ছেলেধরা হত, তাহলে আজ কি হত, বলো তো খোকন ?'

অনুশীলনী

১। 'সেই লোকটা'কে খোকন কেন ভয় করত ?

২। খোকন একদিন যখন হারিয়ে গেল তখন তার হাত ধরেছিল কে ?

৩। বাবা কেন লোকটিকে বকশিশ দিলেন ?

৪। মা লোকটি সম্পর্কে কি বললেন ?

৬। তুমি বা তোমার কোনো বন্ধু কখনও ছেলেধরার হাতে পড়েছ বা পড়েছে ?

৭। 'সেই লোকটা'র একটি ছবি আঁকো এবং তোমার মনের মতো একটি শিরোনাম দাও।

৮। গল্পটি থেকে 'আ' দিয়ে শুরু শব্দগুলির একটি তালিকা তৈরি ক'রে সেগুলির মানে লেখো।

পাখির রাজ্যে পাপু

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র



এবার ছুটির মধ্যে আমার অরণ্য-অভিযানের নিত্য সহচর, পাঁচ বছরের পাপুকে নিয়ে চলি বারুইপুরের কাছে এক পুরনো আমবাগানের জঙ্গলে। ছিল এককালে বনেদী বাবুদের বড় বাগান। এখন লতা-পাতায় আগাছায় জড়িয়ে পুরোপুরি অরণ্যভূমি হয়ে গেছে—পাখিদের অভয়ারণ্য। বাস যাবার পথ থেকে নেমে কিছুদূর যেতেই—পাপুর কানে আসে—

টুক্‌লি পিটিং! টুক্‌লি পিটিং।
টিল্ টিল্ টিল্ টিক্‌লি মিটিং।
টিক্‌ল টিক্‌ল টিক্‌লি টুকিং
কেট্‌লি ফুটিং মিট্‌লো মিটিং॥

একটা নিচু ঝোপ থেকে আওয়াজ আসে। এটা কী পাখি, দাদু? বলো তো?—নাও এই বায়নাক্যুলার—ঝোপের বেশি কাছে এগিয়ো না। পাপু আগ্রহাতিশয্যে বেশি এগিয়ে যেতেই, ভয় পেয়ে একটা ছোট্ট পাখি উড়ে অন্য ঝোপে গিয়ে বসল। ওটা কী, দাদু? আরে, ঐ তো টুন্‌টুনি—দর্জি পাখি।

দেখো কেমন ধূসর পাঁশুটে রঙের মতো হাল্‌কা সবুজ মেশানো। দেখবে সরু ছুঁচলো ঠোঁট দিয়ে সেলাই ক'রে বাসা বাঁধে দর্জির মতো। দেখলে অবাক লাগবে। কিছুদূরে এগোতেই একটা ফল্‌সা গাছের নিচু ডালে মোটা মোটা পাতা সেলাই করা টুনটুনির বাসা মিললো। পাপু অবাক সেই বাসার নির্মাণ-শৈলী দেখে। পাপুর হাত ধরে ঘন আগাছার জঙ্গলে সুঁড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ সমস্ত বনটাকে হল্‌দে আলোয় চমকে দিয়ে পুরনো আমগাছটার ডালে বসল হল্‌দে পাখি। পাপু তার আগেই তার ডাক শুনতে পেয়েছে—যেন বাঁশির আওয়াজ—

ও কিও! কিও কিও!
ও বেনে বউ! ও বেনে বউ!
খুকী হোক্, খোকা হোক্!
ও বেনে বউ, কিও কিও ॥

অনুশীলনী

১। পাখিদের অভয়ারণ্যে এসে পাপু যে গানটি প্রথম শুনলো সেটি মুখস্থ বলো।

২। কথাগুলোর মানে ভেঙে বলো:

অরণ্য অভিযান, অভয়ারণ্য, বায়নাক্যুলার, ধূসর, আগ্রহাতিশয্য, দর্জি পাখি, পাঁশুটে, নির্মাণ-শৈলী, আগাছার জঙ্গল, সুঁড়ি পথ।

৩। টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধা দেখে কেন অবাক লাগে?

৪। আমগাছটার ডালে যে হল্‌দে পাখিটা বসে ছিল তার গলার আওয়াজ পাপুর কানে কেমন শুনিয়েছিল?

৫। ‘ও কিও! কিও কিও!’—এ কোন্ পাখির ডাক?

৬। একটি টুনটুনি পাখির ছবি এঁকে তার বিষয়ে নিজের কথায় কিছু লেখো।

৭। দশটি পাখির নাম লেখো।

৮। বিপরীত শব্দ লেখো:

নিচু, ভয়, দূরে, সরু, ছুঁচলো, নেমে, পুরনো।

৯। বাক্য রচনা করো:

বাগান, বেশি, মেশানো, সেলাই, আওয়াজ।

শালবনে

হেমচন্দ্র বাগচী



গিয়েছিল সন্ধ্যায় শালবনে একেলা।
হু-হু ক'রে হাওয়া বয় নির্জন—
কালো জল, ছোট নদী খঞ্জন—
নুড়িতে নুড়িতে চলে কী খেলা—
সন্ধ্যায় শালবনে একেলা !

পাতায় পাতায় ওঠে শব্দ
পাখি নাই লোক নাই—স্তব্ধ—
কাছে এসে বসো, শোনো সে সময়
কারা যেন ভেসে আসে—কথা কয় !
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ গুঞ্জন—
কালো জল, ছোট নদী খঞ্জন !
দিশাহারা জলধারা নুড়িতে
ছলছলি' যায় চলি' কোথা গো !

যেন দুটি বুড়ো আর বুড়িতে
হাসে আর কথা কয় সেথা গো !
মনে মনে হাসি আর চেয়ে রই !
শুনি কিবা ঝরনার কথা বই !

লোক নাই, পাখি নাই, পোকা নাই
পাতায় পাতায় কারা হাসিছে,
মেঘ নাই, রোদ নাই, ছায়া নাই,
ধূসর ধোঁয়াটে ভরা ভাসিছে।
কালো পাথরের 'পরে সন্ধ্যায়
বসেছিনু শালবনে একেলা।

অনুশীলনী

১। প্রথম দু ছত্র মুখস্থ বলো।

২। সন্ধ্যায় শালবনে একা একা বসে থেকে কবি কি দেখলেন, কি তাঁর মনে হল বলো।

৩। মিল দিয়ে নতুন শব্দ লেখো :

হাওয়া, খেলা, শব্দ, নুড়ি, ভাসিছে।

৪। অভিধান দেখে অর্থ লেখো :

নির্জন, স্তব্ধ, গুঞ্জন, দিশাহারা, জলধারা, কিবা, ধূসর।

বাঘশাল

ক্ষিতিমোহন সেন



একটা খুব দুষ্টু বাঘ ছিল—পথে একলা কাউকে পেলেই ধরে খেত। হাট থেকে বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে অনেক লোক তার পেটের মধ্যে গেছে, বাড়ি আর যেতে পারে নি। একবার একটি ছোট ছেলে তার মায়ের জন্য ওষুধ আনতে দূর গ্রামে গিয়েছিল—মায়ের খুব অসুখ। কবিরাজ বাড়ি ছিলেন না, সন্ধ্যার সময় এসে তিনি ছেলেটিকে ওষুধ দিলেন কিন্তু তাকে বললেব, 'আজ আর যেয়ো না। পথে বড়ই মানুষ-

খেকো বাঘের ভয়।' ছেলেটি কী করে? খেয়েদেয়ে কবিরাজের বৈঠকখানায় শুয়ে রইল।

কিন্তু অনেক রাত্রে তার মনে হল, মায়ের তো খুব জ্বর, আজ ওষুধ না হলে মা কি বাঁচবে? আর ঘরে তো কেউ নেই মাকে জল দেবে! এইসব ভেবে সে রাত্রি একপ্রহর থাকতেই উঠে রওনা হল। সবাই তখন ঘুমিয়ে, তাই কেউ তাকে মানাও করতে পারল না।

ঘোর অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সে চলেছে—অনেক দূরের পথ, একটা লোকেরও সাড়াশব্দ নেই! এমনি তো জঙ্গলের নির্জন পথ, তার উপর রাত্রি, তাতে আবার ভীষণ বাঘের ভয়। তায় ছেলেমানুষ—বারো বছর মোটে বয়স, তবু মায়ের কথা ভেবে সে কিছুই গ্রাহ্য না ক'রে ঐ অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে। তখন শেষরাত্রির পাখিগুলি ডাকতে আরম্ভ করেছে। গাছের আগায় আগায় একটুখানি ভোরের হাওয়া লাগতে আরম্ভ হয়েছে। তার গ্রামও পাহাড়ের ঐ পারে, তখন আর খুব দূরে নয়। ছেলেটি ভাবল, 'যাক, আর ভয় নেই, এখনিই গিয়ে মাকে জল দেব, ওষুধ দেব—এসেই তো পড়েছি।' ওমা! তখন কী ভয়ঙ্কর শব্দ! জঙ্গলের সেই প্রকাণ্ড বাঘ তার ল্যাজটা লটপট ক'রে তার পথ বন্ধ ক'রে সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলেটি তো ভয়ে কেঁপে উঠল। তার গায়েই বা জোর কী! আর হাতে একটি লাঠিও নেই। থাকলেই বা কি করত? সে ওষুধটা কোমরের কাপড়ে বেঁধে কাঠবেড়ালির মতো তরতর ক'রে একটা জোড়া শালগাছের উপর উঠে গেল! জঙ্গলের দেশের ছেলে তো, সবাই তাই খুব গাছে চড়তে পারে।

বাঘ তো রেগেই খুন। তার জিভ দিয়ে জল বেরুচ্ছিল, দুই-একবার জিভ দিয়ে তাই চাটল। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য ক'রে ভয়ঙ্কর গর্জন ক'রে প্রকাণ্ড একটা লাফ দিল। লাফ দিয়ে বাঘটা এত উঁচুতে উঠল যে ছেলেটি তখনও অত দূরে উঠতে পারে নি। ছেলেটির তো ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল। বাঘটা একেবারে তার মাথার উপর গিয়ে হুড়মুড় ক'রে পড়ল। ওমা! হল কী! ঐ শাল-

গাছটা কিনা জোড়া শালগাছ ছিল— বাঘটা ঐ উঁচুতে দুটো শালগাছের ফাঁকের মধ্যে গেল পড়ে— তার নিজের ভারে জোড়া গাছের সংকীর্ণ ফাঁকে সে নিজেই জাঁতাকলে গেল আটকে। ছেলেটির চাদরটা বাঘের নখে লেগেছে তবে তার গায়ে আঁচড় লাগে নি।

ছেলেটি ভয়ে একেবারে নেমে এল মাটিতে। তখন আরম্ভ হল খুব ঝড়। দুই গাছের পেষণ লেগে বাঘটা খাঁউ খাঁউ ক'রে চিৎকার ক'রে কাঁচি কলের ইঁদুরের মতো পিষে মারা গেল।

তখন ভোর হল। ছেলেটি মায়ের কাছে দৌড়ে গিয়ে ওষুধ দিল। গ্রামের লোক দেখে অবাক! রাজা ছেলেটিকে পুরস্কার দিলেন। মায়ের ওষুধপথ্য রাজাই ব্যবস্থা করলেন। গ্রামের লোকেরা এখনও সেই দিনে ঐ জোড়া শালগাছের তলায় মাতৃভক্ত ছেলের নামে মেলা বসায়।

অনুশীলনী

১। অভিধান দেখে মানে লেখো :

কবিরাজ, বৈঠকখানা, একপ্রহর, নির্জন, শেষরাত্রি, ভয়ঙ্কর, গর্জন, মাতৃভক্তি।

২। যে-সব বাঘ মানুষ ধরে ধরে খায় তাদের এক কথায় কি বলে ?

৩। ছেলেটি কেন গভীর রাতে বাঘের ভয় থাকা সত্ত্বেও জঙ্গলের পথে রওনা হল ?

৪। জঙ্গলের পথে ভোরবেলা প্রকাণ্ড বাঘটিকে ল্যাজটা লটপট ক'রে শুয়ে থাকতে দেখে ছেলেটির কি দশা হল ?

৫। 'বাঘ তো রেগেই খুন'—কেন ?

৬। বাঘ কাঁচি-কলের ইঁদুরের মতো পিষে মারা গেল কি ক'রে ?

৭। বাক্য রচনা করো :

একলা, অসুখ, মানা, প্রকাণ্ড, তায়, সংকীর্ণ।

ঘোষাল-পুকুর

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ঢল ঢল কালো জলে ভরা,
সারি সারি তালগাছ পাড়ে,
কে না চেনে ঘোষাল-পুকুর
গ্রামে যেতে রাস্তার ধারে।

সকাল বিকালে বাঁধাঘাটে
রাখাল-বালক করে খেলা।
পাকা তাল কুড়াবার লাগি'
ছেলেরা ঘুরিছে দুইবেলা।

একদিন দু'টি পাকা তাল
শিশু এক কুড়াইয়া পায়,
আর শিশু হাত হতে টানি'
সবলে কাড়িয়া নিতে চায়।

না পারিয়া জোরে কেড়ে নিতে
বালক বলিল বারবার,
'এ পুকুর কিনেছি আমরা,
জানিস তোদের নয় আর।'

তাল দু'টি এতক্ষণ ধরি'
বুকে চাপি' রেখেছিল টুনী—
নামায়ে রাখিল ধীরে ধীরে
শুধু এই দু'টি কথা শুনি।

জননী দাঁড়ায়ে ছিল দূরে,
কাছে গেল শিশু ম্লানমুখে ;
পুকুর-বেচার ব্যথা আজি
প্রথম জাগিল মার বুকে ॥

অনুশীলনী

১। টুনীর মা কেন দুঃখ পেলেন ?

২। পূরণ করো :

ঢল ঢল কালো ——। এ পুকুর —— আমরা। একদিন —— পাকা তাল।

৩। সম্পূর্ণ কথাটি লেখো :

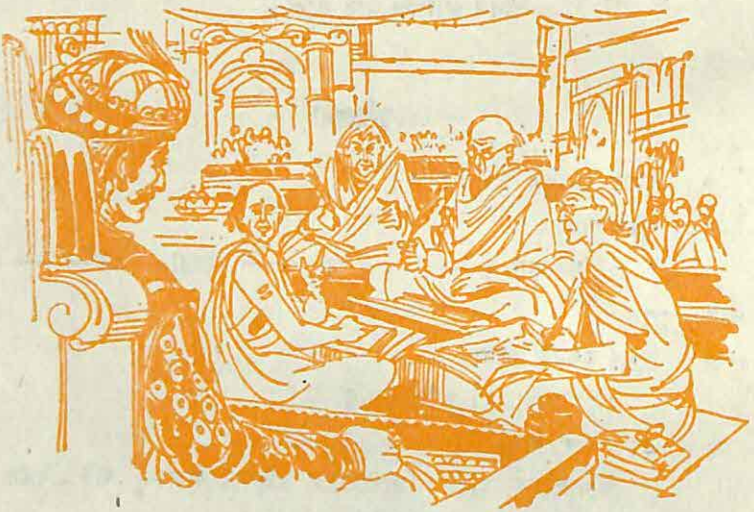
লাগি' ; টানি' ; চাপি' ; ধরি'।

৪। এক কথায় লেখো :

ঘোষালদের পুকুর ; রাখালদের ছেলে ; বাঁধানো ঘাট ; গাছে পেকেছে ; যে গাছে তাল হয়।

স্বপ্নে দেখা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কপিলাবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাত, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির, মঠ। আরো ওধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত — সাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওপারে আকাশ-জুড়ে আশ্চর্য এক সাদা আলো, তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন! রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কী চমৎকার স্বপ্নই দেখলাম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর সে কোথায় গেল আর দেখতে পেলাম না! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল।'

রাজা-রানী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে

রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাখঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানীর পোষা ময়ূর ছাতে এসে উড়ে বসল, সোনার খাঁচায় শুকসারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু ক'রে দিল, ভিখিরী এসে—'জয় রানীমা!' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে-দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল। কপালে রক্তচন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলী, সকালে সূর্যের মতো শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো ক'রে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর— সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর— শ্বেতছত্তর খুলে, আর ওপাশে নগরপাল— ঢাল-খাঁড়া নিয়ে।

রাজার দুইদিকে দুই দালান; একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর এক-দিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে যত দুয়ারী— মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল-পাগড়ির ভিড়।

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার ঠিক নিচে আটখানি রক্ত-কম্বলের আসন, তারি উপরে রাজার আট গনৎকার খড়িহাতে, পুঁথি খুলে, রানীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারো মাথায় পাকা চুল, কারো মাথায় টাক, কারো বা ঝুঁটি বাঁধা, কারো বা ছাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে রানীর স্বপ্নের ফল গুনে বলছেন:

'সূর্যস্বপ্নে রাজচক্রবর্তী পুত্র মহাতেজস্বী। চন্দ্রে তথা রূপবান গুণবান রাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী। শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎ দুর্লভ এবং জীবের দুঃখহারী মহাধার্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ। এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ করো।'

চারিদিকে অমনি রব উঠল—‘আনন্দ করো, আনন্দ করো! অন্নদান করো, বস্ত্রদান করো, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান করো।’ কপিলাবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে লাগল। রাজমুকুটের মানিকের দুল, রাজছত্তরের মুক্তোর ঝালর, মন্ত্রীর গলায় রাজার-দেওয়া কণ্ঠমালা, পণ্ডিতদের গায়ে রানীর দেওয়া ভোটকম্বল, দাসদাসী দীনদুঃখী ছেলে-বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির চেলী আনন্দে দুলতে থাকল।

অনুশীলনী

১। মানে শেখো :

নবৎখানা, অন্দরমহল, শুকসারী, রক্তচন্দন, দণ্ডধর, ছত্রধর, নগরপাল, রায়বাঁশের লাঠি, রক্তকম্বলের আসন, রাজচক্রবর্তী, দুঃখহারী, শাক্যবংশ, অন্নদান, ভোটকম্বল, দীনদুঃখী।

২। কপিলাবাস্তুর রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে শুয়ে কি স্বপ্ন দেখেছিলেন ?

৩। সোনার খাঁচায় শুকসারী যখন খাবারের জন্যে দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছিল তখন ‘জয় রানীমা’ বলে দরজায় কে এসে দাঁড়াল ?

৪। রাজা শুদ্ধোদন যখন রাজসিংহাসনে বসলেন তখন তাঁর আশপাশে রাজসভায় কারা ছিল ?

৫। রানীর স্বপ্নের গণনা ক’রে গনৎকাররা শাক্যবংশে কী রকম পুত্র লাভ হবে বলেছিলেন ?

৬। রাজরানী মায়াদেবী এবং রাজা শুদ্ধোদনের যে পুত্র জন্মালেন তিনি কে ?

৭। বাক্য রচনা করো :

চারিদিকে, ওপারে, মাঝখানে, পাশে, নিচে।

ডং

সত্যজিৎ রায়

আঁধার যখন থমথমিয়ে নামে
ঘুমভুলিয়ার গ্রামে,
গুমরে যখন ওঠে ক্ষণে ক্ষণ
সাগরপাড়ে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের গরজন,
ভুসভুসে সব মেঘরা একে একে
চ্যাংলি পাহাড় চুড়োয় গিয়ে ঠেকে—

তখন তুমি দেখতে পাবে চেয়ে
অন্ধকারে জ্বলজ্বলে এক ফুলকি আসে ধেয়ে ;
চারদিকে সব কালো
মধ্যিখানে বিন্দু সে-এক আলো
এদিক পানে ওদিক পানে ছোটে
হঠাৎ থেমে ঝিলিক দিয়ে উপর দিকে ওঠে,
আবার পরক্ষণেই
ঢুকল যেন বঙ্গীগাছের বনেই।
মাঝরাত্রে দেখছে যারা একে
ছাতের উপর থেকে,
সবাই মিলে চেঁচিয়ে তারা ওঠে—
'ডং এসেছে !   ওই দেখো ডং ছোটে !
বনের মধ্যে ডং
ডং-এর দেখো ঢং
নাকের ডগায় ঝিলিক মারা সং !

অনুশীলনী

১। 'ডং' কাকে বলা হচ্ছে ?

২। ঘুমভুলিয়া গ্রাম, ভুসভুসে মেঘ, চ্যাংলি পাহাড়, বঙ্গীগাছের বন — এর দেখাদেখি দুটো মজাদার কথা বানাতে পারো ?

৩। নিচের আওয়াজগুলো শুনলে কিসের কথা মনে আসে :

থমথমে, ভুসভুসে, জলজলে।

৪। মিল দাও :

সাগর, কালো, আবার, একে, দেখো।

বড়ো খবর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশাই, এখনকার কালের একটা খুব বড়ো খবর দাও দেখি খুব ছোটো ক'রে, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা।

আচ্ছা শোনো।

শান্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনী নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে! দাঁড়ের দল ঠক্‌ঠক্ করতে করতে মাঝির বিচার-সভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল, বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটলোক। কেননা আমরা দিনে রাতে নিচের

পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক ক'রে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটোলোক হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী ক'রে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপিচুপি বললে, ওর কথায় কান দিয়ো না ভায়ারা। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা ব'লে থাকে। তোমরা জোয়ানরা সব মরি-বাঁচি ক'রে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ ক'রে গুটি-সুটি মেরে পড়ে থাকেন নৌকোর চালের উপরে। তখন ফড়্-ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু, সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক ?

মাঝির ভয় হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মশায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা! কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও, সে তো মজুরের কর্ম! তুমি আপন ফুর্তিতে চল আর তোমার ইয়ারবক্সিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে! আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়গুলোর ইৎরমিতে তুমি কান দিয়ো না। ভায়া, ওদের এমনি ক'ষে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপ্‌ঝপানি থাক-না, কাজ না ক'রে উপায় নেই।

শুনে পাল উঠলো ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগলো। কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়! দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে দাঁড়েরা চালায় নৌকো— ঝড় হোক, ঝাপটা হোক, উজান হোক, ভাটা হোক।

অনুশীলনী

১। বাক্য রচনা করো :

মহাজনী নৌকোয়, ঘোরতর, পালে আর দাঁড়ে, কদর, জোট বেঁধে, বাবুয়ানা, মজবুত, ঝাপটা, উজান, ভাটা।

২। কুসমি তার দাদামশাইয়ের কাছে কিরকমের গল্প শুনতে চাইল ?

৩। পাল আর দাঁড়ের ঝগড়া কি নিয়ে ?

৪। নিচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলে বলেই কি দাঁড়ের কদর কারুর চাইতে কম ?

৫। পাল কি চালে চলে ?

৬। মাঝি উঠলে পালের কান ভারী করল কি বলে ?

৭। ঝড় উঠলে নৌকোকে কে বাঁচাবে—পাল না দাঁড় ? কি ভাবে ?

৮। নিচের বিধেয়গুলির সঙ্গে উপযুক্ত উদ্দেশ্য যুক্ত ক'রে সম্পূর্ণ বাক্য লেখো :

ঠেলে চলে। ব'লে থাকে। বেড়াতে হয়। ফুলে উঠল। ধরা পড়বে।

৯। এই গল্পটি থেকে পাঁচটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য ও পাঁচটি বস্তুবাচক বিশেষ্য খুঁজে নিয়ে লেখো।

বোশেখী ছড়া

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গাঁর শেষে পথ শেষ, ভোলা মাঠ শুরু।
কচি অশথের পাতা কাঁপে ঝুরু ঝুরু ॥
ঝুরু ঝুরু কাঁপে পাতা উড়ু উড়ু মন।
ঠিক দুপুরের কোলে দোলে শরবন ॥
শরবনে বীণ বাজে সরস্বতীর।
মাটির ঘোড়ায় মাঠে ছুটে চলে পীর ॥
ঝিনঝিন করে দিন প্রাণ আইঢাই।
চ্যালাবন খুঁজে দুটো তরমুজ খাই ॥
চোখ বুঁজে তরমুজে শুনি কিচমিচ।
কেটে দেখি গুচ্ছের উচ্ছের বীচ।

অনুশীলনী

১। মুখস্থ বলো।

২। মিল দাও : ঝুরঝুর ——। কোলে ——।
চোখ বুঁজে ——। গুচ্ছের ——।

৩। কবিতাটি থেকে চারটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং চারটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ খুঁজে লেখো।

৪। শেষ চার লাইন গদ্যে লেখো।

আর্জানের গ্রাম

শিবশঙ্কর মিত্র



আর্জানের গ্রামের নাম কালিকাপুর। খুলনা জেলার সুন্দর বন ও লোকালয়ের সীমান্ত এই গ্রাম। গ্রাম বললে হয়তো ভুল হবে। চারিদিকে নদীনালা। তারই মাঝে মাঝে ধু ধু করছে মাঠ। নদীর জল থেকে শস্য বাঁচাবার জন্য মাঠগুলির চারিদিকে দশ হাত উঁচু মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা। এই বাঁধের ধারে ধারে মাটি উঁচু ক'রে চাষীরা ঘর বাঁধে। কিছু গাছপালাও জন্মায়। কয়েক মাইল দূরে দূরে এই রকম চাষীর পাড়া আছে। একেই এ দেশের লোকে গ্রাম বলে।

মাত্র ষাট বছর আগে ভাটি অঞ্চলের মানুষ বাদা কেটে কালিকাপুরের আবাদ পত্তন করেছিল। কয়রা নদী সাপের মত বেঁকে কালিকাপুরকে তিন দিকে ঘিরে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে বয়ে গেছে। কয়রা নদী বরা‍ের এক পাশে বন। অন্যপারে লোকালয়। বাদা ও আবাদের সীমানা।

কয়রা নদী অতি ছোট। এপার থেকে ওপারের বনকে স্পষ্ট দেখা যায়। বাঘের রাজ্য আর মানুষের রাজ্যের এই সীমানা খুবই নগণ্য।

মানুষের কাছেও এই সীমানা যেমন কোন বাধাই নয়, বাঘ ও হরিণের কাছেও এই সীমানা তেমনি কিছুই নয়। সুন্দরবন অসংখ্য নদীনালায় পূর্ণ। সুন্দরবনের জীবজন্তুকে অনবরতই এই নদীনালা পার হতে হয়। কয়রার এপার থেকে চাষীরা বাঘের আর হরিণের ডাক শুনে জল্পনা করে; বাঘ ও হরিণও এপার থেকে মানুষের কোলাহল শুনতে অভ্যস্ত।

আর্জানের বাড়ি কালিকাপুরের দক্ষিণ প্রান্তে। খুলনা জেলার শেষ বসতি বলা যেতে পারে। বাঙলার লোকালয়ের শেষ সীমানা। বাঙলারই মাটি।—তবুও এই লোনাজল আর লোনামাটির দেশ, বাঙলার মিষ্টিজল আর মিষ্টিমাটির মানুষ থেকে যেন অনেক দূরে।

এ দেশে পথ নেই বললেই হয়। তবে পথঘাট আছে সর্বত্র। অফুরন্ত নদ ও নদীর দেশ। কালিন্দী, রায়মঙ্গল, কপোতাক্ষী, মৈঁশালি, শিবসা, ভদ্রা, পশর, কয়রা, মার্জার — কি সুন্দর নামই না এই নদ ও নদীর।

এইসব নদীপথে দূর দূরান্ত থেকে বাঙলার মানুষ আসে লোনা দেশে। তারা আসে লাল, নীল হলদে রঙের পাল টাঙিয়ে; জোয়ার আর ভাটির টানে নৌকো ভাসিয়ে,—লোনা মাটির সোনার ফসল ও বন সম্পদ বয়ে নিতে।

অনুশীলনী

১। অভিধান দেখে মানে শেখো:

সুদূর, লোকালয়, সীমান্ত, ধু ধু, জল্পনা, ভাটি অঞ্চল, বাদা কেটে, অফুরন্ত, দূরান্ত।

২। আর্জান সর্দারের গ্রামটি কোন্ অঞ্চলে ছিল?

৩। ষাট বছর আগে কালিকাপুরে মানুষ কি করেছিল?

৪। বাঘ আর মানুষের রাজ্যের সীমানা বলতে এখানে কি বলা হচ্ছে?

৫। সুন্দরবনের একটি রঙিন ছবি আঁকো যার বিষয়টা হবে—

'কয়রার এপার থেকে চাষীরা বাঘ ও হরিণের ডাক শুনে জল্পনা

করে ; বাঘ ও হরিণও ওপার থেকে মানুষের কোলাহল শুনতে অভ্যস্ত।'

৬। বাক্য রচনা করো :

বাদা ও আবাদ, লোনাজল আর লোনামাটি, মিষ্টি জল আর মিষ্টি মাটি, দূরদূরান্ত, ভাটির টানে।

৭। কোন্‌টি কি পদ লেখো :

গ্রাম, করেছিল, তারা, লোনা, কি।

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ করো :

(ক) সুন্দর —— জীব —— অনবরতই —— পার —— হয়।

(খ) নদী —— দূর —— থেকে —— আসে।

(গ) নদীর —— থেকে —— বাঁচাবার জন্যে —— চারিদিকে —— হাত —— মাটির —— দিয়ে ——।

তাড়কা বধ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রামেরে বলেন মুনি, 'হেথায় রে ধন,
'তাড়কা' রাক্ষুসী থাকে, বিকট বদন।
রক্তখাকী হতভাগী ভারি বল ধরে,
লোকজন মেরে বন করেছে নগরে ;
এই পথে যেই যায়, তারে খায় গিলে,
আপদে মারহ বাপ দুই ভাই মিলে।'

মরিবে রাক্ষসী বুড়ি, রক্ষা নেই তার,
তখনি দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার।
'টং-টং' রবে তার রুষি ভয়ঙ্কর,
দাঁত কড়মড়ি বুড়ি কাঁপে থর-থর।
'হাঁই-মাঁই-কাঁই' করি ধাঁই-ধাঁই ধায়,
হুড়মুড়ি ঝোপঝাড় চুরমারি পায়।
গরজি-গরজি বুড়ি ছোটে, যেন ঝড়,
শ্বাস বয় ঘোরতর ঘড়র-ঘড়র।
কান যেন কুলো তার, দাঁত যেন মুলো,
জ্বল-জ্বল দুই চোখে জ্বলে যেন চুলো।
হাঁ করেছে দশ গজ, তাহে জিভ খান,
লকলকে চকচকে দেখে ওড়ে প্রাণ!
বিষম ধুলোর ঘোরে দোঁহারে ঘেরিয়া,
পাথর ছুঁড়িয়া বুড়ি মারে চেঁচাইয়া।
কোনো ডর নাহি পায় তাহে দুই ভাই,
ডাক শুনি লাখ বাণ মারে সাঁই সাঁই।

দেখা দিল বুড়ি তাই ফাঁপর হইয়া,
পাহাড় বেরুল যেন দাঁত খিঁচাইয়া।
হাত নাক কান কাটি বুকে হানি বাণ,
দুজনে তখন তার বধিল পরান।

অনুশীলনী

১। তাড়কা কেমন দেখতে?

২। দুভাই কে কে?

৩। মিল দাও :

থর থর, ঝোপঝাড়, জলে, বুড়ি, শুনি।

৪। গদ্যের ভাষায় লেখো :

মারহ, হেথায়, কড়মড়ি, ঋষি, চুরমারি, গরজি, তাহে, দোঁহারে, বধিল।

বাজনা

শৈলেন ঘোষ



মা আদর ক'রে নাম রেখেছে বাজনা।

বাজনা একটি ছোট্ট ছেলে।

নাক চ্যাপটা ছেলেটার চোখ দুটো কেমন গোল গোল! দুষ্টুমি মাখা!

দাঁত ফোকলা ছেলেটার গাল দুটো কেমন ফুলকো! যেন আস্কে পিঠে! উফ! কী দুষ্টু! ছেলে নয়তো দস্যি!

বাজনা। নাম শোন! হাসি পায় না? আহা! বুঝি আর নাম ছিল না ভূভারতে?

বাজনা মায়ের কাছে থাকত। উঃ বাবা! ছেলের জন্যে মা তো জ্বালাতন-পোড়াতন! মায়ের হাড়-মাস একেবারে কালি! মা কত আদর করত, কত বোঝাত, কত গান শোনাত। বয়ে গেছে গান শুনতে। বাজনা কিছুতেই গান শুনবে না। মা গান গাইলেই বাজনা

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্প বলতে শুরু দেবে। শুনতে হবে। নইলে ছাড়ান আছে ?

মাকে গল্প বলত বাজনা ল্যাজ-কাটা কুকুরটার। কান-ছেঁড়া ছাগলটার। আর নোলক-পরা হাঁসটার।

আর গল্প বলত,

কার বাড়িতে কুলগাছে কুল ধরেছে।

কাদের ঘরে জাম গাছে জাম ফলেছে।

কার বাগানে আমগাছে আম পেকেছে।

গল্প বলতে বলতে রাত আসত। বাজনার ঢুল আসত। ঘুমিয়ে পড়ত।

মা চেয়ে চেয়ে দেখত বাজনার মুখের দিকে, ঘুমন্ত চোখের দিকে। দেখতে দেখতে চোখের পাতা দু'টি ভিজে যায় মার। বাজনা সারাদিন দুষ্টুমি করবে। মা কত বকবে। আর এখন ? মা সব ভুলে যায়। যতই হোক, ছেলে তো ! আদর করবে মা ছেলেকে। বলবে, 'সোনা আমার, চাঁদ আমার !' তারপর মা-ও ঘুমিয়ে পড়বে। রাত কাটবে।

সকাল। সকাল মানেই তো আলো।

আলোর সকাল প্রথমে আকাশে ছড়িয়ে যায়। তারপর সকাল নামে আকাশ থেকে গাছের পাতায়।

সবুজ ঘাসে।

রঙিন ফুলে।

নদীর দোলায়।

আর ?

বাজনার চোখে।

ঠিক তখুনি মা ডাকল, 'বাজনা।'

ঘুম থেকে উঠে পড়ল বাজনা। সাড়া দিলে, 'কেন মা ?'

মা বলল, 'বাজনা, নদীর থেকে এক ঘটি জল এনে দাও তো।'

বাজনা যেন হাতে চাঁদ পেল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'যাই মা।'

মা বলল, 'মাঠে মাঠে ছুটো না যেন !'

'না, না।'

'গাছে গাছে উঠো না যেন !'

'না, না।'

'নদীর জলে নেমো না যেন !'

'না, না।'

'যাবে আর আসবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' বলে বাজনা কোঁচড়ে মুড়ি নিল। হাতে ঘটি নিল। মায়ের জন্যে জল আনতে হাঁটা দিল। কেমন হাঁটছে দেখো! যেন কত লক্ষ্মী! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!

সবুজ ঘাসে রোদ ছড়ানো। মায়ের চোখের আড়াল হতেই ছুট দিল বাজনা ঘাসের ওপর দিয়ে।

অনুশীলনী

১। বাজনা নামটা তোমার কেমন লাগে ?

২। বাজনা ছেলেটার স্বভাব আর চেহারা কেমন ছিল ?

৩। বাজনার পুষ্যিগুলোর বিবরণ দাও।

৪। বাজনা মাকে কিসের গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ত ?

৫। বাজনা ঘুম থেকে ওঠার পর মা তাকে কি কি করতে বারণ করতেন ?

৬। বাজনার দুটি ছবি আঁকো :

(১) দাঁত কোকলা, গোল গোল দুষ্টুমি-মাখা চোখ, নাক চ্যাপটা।

(২) 'সোনা আমার, চাঁদ আমার'—ধরনের। ছবি দু'টির তলায় শিরোনাম লেখো।

নিজস্ব সংবাদদাতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আকাশে লাল রঙের একটা ঘুড়ি উড়ছে। পাঁচিলের ওপাশে কে যেন কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলা করছে। রান্নাঘরে উনুনে দুধ পুড়ছে। কাঠের চেয়ারটা খুব শক্ত। চায়ে চিনি হয়নি।

একা এক জায়গায় বসে এতগুলো খবর আমি পেয়ে গেলাম। তার জন্যে আমাকে আদৌ দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়নি।

আমার একদল নিজস্ব সংবাদদাতা আছে। তারাই আমাকে একে একে এই খবরগুলো দিল। পাঁচ রকমের খবর তারাই যোগাড় ক'রে আনে। আমি যেখানেই থাকি তারা আমাকে খবর এনে দেয়। আমাকে কখনই তারা ছেড়ে যায় না।

পাঁচ রকমের খবর জানবার জন্যে আমার পাঁচটি বিশ্বস্ত সংবাদদাতা আছে। তার মধ্যে তিনটি খুব তুখোড়; যেখানে আমার হাত যায় না, সেখানকার খবরও তারা যোগাড় ক'রে আনতে পারে। বাকি দুটিও আমার খুব বিশ্বস্ত; তবে তাদের দৌড় বেশি নয়।

আমার এই নিজস্ব সংবাদদাতাদের নাম জানবার জন্যে নিশ্চয় তোমার খুব ইচ্ছে করছে। নাম বললেই তুমি তাদের চিনবে।

একটির নাম চোখ। তার কাজ হল দেখা। কোনো জিনিস আমার সামনে থাকলে বেশ খানিকটা দূরে থেকে আমার চোখ তা বলে দিতে পারে।

একটির নাম কান। কোনো জিনিস আড়ালে থাকলেও আওয়াজ শুনে তার খবর পৌঁছে দেয় সে।

যার নাম নাক, সে আমাকে কোনো একটা জিনিসের গন্ধ পাইয়ে দেয়।

দূর থেকে টের পাইয়ে দেয় বলেই চোখ, কান আর নাককে আমি বলি তুখোড় সংবাদদাতা।

বাকি দুটি সংবাদদাতার মধ্যে একটি হল আমার গায়ের চামড়া—যার ভালো নাম ত্বক্। অন্যটি হল জিভ—যার ভালো নাম রসনা। এরা আবার কোনো জিনিসের সঙ্গে নিজেরা জড়িয়ে না পড়লে আমাকে সে-জিনিসটার খবর দিতে পারে না। গায়ে লাগলে তবেই বুঝি হাওয়াটা ঠাণ্ডা, জিভে ঠেকলে তবেই বুঝি আমটা মিষ্টি।

চোখ, কান, নাক, ত্বক, জিভ—আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলেও এদের মধ্যে খুব বনিবনা আছে। চোখ যে খবরটা আনছে বাকি সকলে তার ভাগ পেতে পারে। আবার তেমনি অন্যরা যে খবরগুলো আনছে, চোখও তার ভাগ পেতে পারে।

চোখ যদি কাউকে বন্দুক ছুঁড়তে দেখে, কানকে ইশারা ক'রে দেবে—এবার কিন্তু জোর শব্দ হবে। তেমনি আবার কান যদি বাঘের ডাক শোনে, ডোরাকাটা বাঘের বিকট চেহারাটা সে ইশারায় চোখকে জানিয়ে দেবে। আমার নিজস্ব সংবাদদাতারা পাঁচটি পাঁচ রকমের হলেও তারা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে।

অনুশীলনী

১। মানে বলো :

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুখোড়, বিশ্বস্ত, ত্বক, রসনা, বনিবনা, ইশারা, ডোরাকাটা, বিকট, মিলেমিশে।

২। এখানে নিজস্ব সংবাদদাতা কাদের বলা হচ্ছে ?

৩। এক কথায় আমাদের এই সংবাদদাতাদের কি বলে বোঝানো হয় ?

৪। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতারা কে কি কাজ করে ?

৫। বাক্য রচনা করো :

চামড়া, ঠাণ্ডা, ঘুড়ি, উনুন, দূরে।

৬। কোন্‌টি কি পদ লেখো :

লাল, খবর, জন্ত, চিনবে, আমার।

ঘুমপাড়ানী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব তোরে
আঁচলটা তোর ভরে ভরে,
আয় রে আয় রে মধুকর
ডানা দিয়ে বাতাস কর,
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।
আয় রে চাঁদের আলো আয়।
হাত বুলিয়ে দে রে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে।
পাখি রে, তুই কোসনে কথা,
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বলো।

২। কবি কাকে কাকে আসতে বলছেন ?

৩। মিল দাও :

যাবি নিয়ে ——। দে রে গায় ——। কথা ——।

৪। গদ্যের ভাষায় লেখো :

বা, প'ল, কোসনে, থুয়ে।

ভেলকি

পরিমল গোস্বামী



ছোটবেলায় পাড়াগাঁয়ে বাস করতাম। সে অনেক দিনের কথা। সেটা বোমার যুগ, বিলিতি কাপড় বর্জনের যুগ, রাখী বন্ধনের যুগ, এক কথায় স্বদেশী যুগ। এই সময় সেই দূর পাড়াগাঁয়ে দু-তিনটি জিনিস দেখে আমি সত্যি অবাক হয়েছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বেদেনীদের ভেলকির খেলা, এখন যাকে তোমরা ম্যাজিক বল, তাই। আর একটি বহুরূপীর মজা। এ ছাড়া কলের গান, বাইসিকেল, ফটোগ্রাফ তোলা—এ সব ত আছেই। সব তখন নতুন, আর অল্প বয়সের দৃষ্টিও নতুন, তাই সবই অদ্ভুত মনে হত।

বেদেনীদের সম্বল ছিল মাত্র একটি থলে। সে থলে বহু রকম টুকরো জিনিসে বোঝাই! একখানা মানুষের হাড় বার করত থলে থেকে, তাই

দিয়ে আঘাত না করলে ম্যাজিক হত না। হাতের মুঠোয় ছোট বল, হাত দিয়ে আঘাত ক'রে বলত, 'লাগ ভেলকি', অমনি বল উধাও! থলে থেকে একটি ছোট্ট কাঠের বাটি বেরুল। সেটাকে উপুড় ক'রে রাখল। তার উপরে বোতামের মত একটি গুলি লাগানো। ডান হাতের দুটো আঙুল তার দু'পাশে ঠেলে দিয়ে চেপে বাটিটা তুলে দেখাল কিছু নেই! তারপর সেই হাড়—'চণ্ডালের হাড়', একটু ঠুকে দিতেই বাটির নিচে তিনটি বল এসে হাজির। তারপর থলে থেকে একটি কাঠের ব্যাঙ বার ক'রে রাখল সবার সামনে। বেদেনী দুখানা হাত পেতে ব্যাঙকে ডাকল, তখুনি ব্যাঙ লাফ দিয়ে উঠে এল তার হাতে।

এক রকম সব খেলা। দেখে খুব উত্তেজনা! তার ঐ হাড়ের উপর খুব যে ভক্তি হয়েছিল তা নয়। এবং একবার হাতের মুঠোয় কৌশলে রাখা কাপড়ে তৈরি বল, উপুড় করা বাটির একটি ধার উঁচু করতেই তার নিচে চলে গেল, তাও চকিতে দেখেছিলাম। কিন্তু খেলা দেখানোর ওস্তাদিটাই মনকে ভরে রাখল। ওসব তুচ্ছ হয়ে গেল আমার কাছে। সমস্ত সহানুভূতি এবং আকর্ষণ তখন বেদেনীর দিকে! প্রথম ম্যাজিক দেখার সে আনন্দ আজও মনে আছে।

তারপর বহুরূপী। প্রথম দিন সে সবাইকে ঠকিয়েছিল। ভোর বেলা সূর্যোদয়ের আগে এক সাহেব এসে গটগট ক'রে কি সব অর্থহীন কথা সাহেবী ধরনে উচ্চারণ ক'রে চলে গেল। কিছু পরে শোনা গেল সে বহুরূপী, এবং অনেকের বাড়িতেই এইভাবে হানা দিয়েছিল। আসলে সে সাহেব নয়। তারপর সে এমন এক খেলা দেখাল যা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। সে সাহেব সেজে একটি শক্ত আসনে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, এবং একটি ছেলে সেই আসনটাকে মাথায় ক'রে সাহেবটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। চৌকো আসন, চারদিকে কাপড় দিয়ে ঘেরা। সাহেব মাঝে মাঝে ছেলেটাকে ধমকাচ্ছে, বলছে, জোরে চল। ছেলেটির দুর্দশা দেখে কষ্ট হচ্ছিল বেশ, কিন্তু দৃশ্যটাও অভিনব, তাই সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছোট ছেলের দল অনেকটা ঘুরেছিলাম।

আসলে কিন্তু নিচে কোনো ছেলেই ছিল না। সাহেব নিজেই চলেছিল নিজের পায়ে। কিন্তু সে তার কোমরের চারদিকে এমন একটি চৌকো হাল্কা ফ্রেম এঁটে নিয়েছিল যে সেটাকেই আসন মনে হচ্ছিল। ফ্রেমের মাঝখান দিয়ে সাহেবের কোমর থেকে পা নেমে গেছে, কিন্তু তার চারদিকে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকাতে তা বোঝা যাচ্ছে না। সাহেবের যে দুখানা প্যান্ট-মোজা-জুতো পরা পা বাইরে ঝুলছিল, তা খড়ের তৈরি। অথচ সেই দুখানা পাকেই আসল পা মনে হচ্ছিল — কোনো ছেলের মাথায় রাখা কাঠের আসনে পা ঝুলিয়ে বসলে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি। আমার মত কথায়-কথায় অবাক হওয়া ছেলের মাথায় এই খেলা তখন ভীষণভাবে নাচছে।

সেই দিনই রাত্রে যখন আমার এক দাদা ঠিক ঐ জিনিস তৈরি ক'রে সাহেব সেজে সবটা কৌশল দেখিয়ে দিলেন, তখন ঐ বহুরূপী লোকটার উপর ভক্তি আরও বেড়েই গেল।

অনুশীলনী

১। 'লাগ ভেলকি' খেলা আসলে কিসের খেলা ?

২। তুমি কখনও ম্যাজিক দেখেছ ?

৩। ম্যাজিকের খেলা তোমার কেমন লাগে ? জীবনে যত ম্যাজিকের খেলা দেখেছ তার মধ্যে তোমার কোনটি সব চাইতে বেশি মনে আছে ?

৪। সাহেবের বেশে বহুরূপী যে খেলাটি খেলেছিল তার বর্ণনা দাও।

৫। নিচের কথাগুলোর মানে কি ?

বোমার যুগ, বিলিতি কাপড় বর্জনের যুগ, বেদেনী, রাখীবন্ধনের যুগ, কলের গান, বহুরূপী, ওস্তাদি।

বেলা দুপুর

অমিতাভ চৌধুরী

বেলা তখন দুপুর
রোদের ঘটি উপুড়।
কাশীপুরে এসে দেখি
বাড়ি নেইকো নূপুর।
যে-ই না এলাম বাইরে
রোদের দেখা নাই রে
বৃষ্টি টাপুর টুপুর,
বেলা তখন দুপুর।

অনুশীলনী

১। ছড়াটি মুখস্থ বলো।

২। মিল দাও:

নাই রে ——। দুপুর ——।

৩। 'বিকাল' নিয়ে চার লাইনের ছড়া লিখতে পারো?

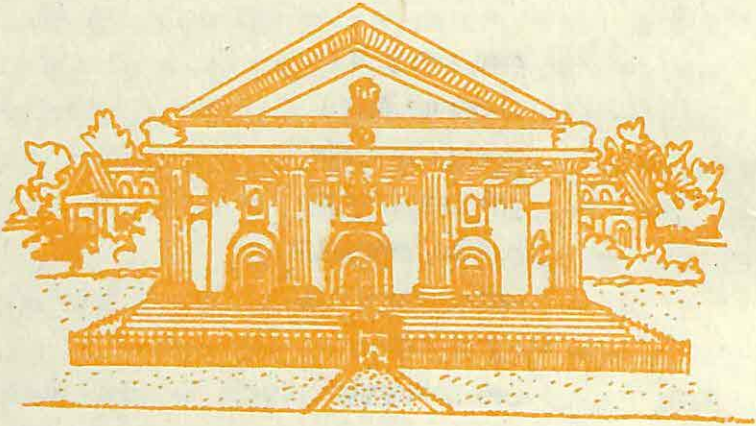
৪। টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ার একটি রঙিন ছবি আঁকো।

৫। কোন্‌টি কোন্ পদ লেখো:

রোদ, এসে, রে, দেখা, উপুড়।

টাঁকশাল

জ্যোতিভূষণ চাকী



আজকে একটা ছোট্ট ছেলেও জানে পয়সা দিয়ে সে ইচ্ছে মতো জিনিস কিনতে পারে। আর কত পয়সায় কি, কতটুকু জিনিস পাওয়া যেতে পারে তার মোটামুটি একটা ধারণাও তার আছে। কিন্তু পুরনো দিনে যখন টাকা পয়সার চল ছিল না, তখন কেনাকাটা ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। শ্রম, পণ্য বা গো-ধনের বিনিময়ে তখন বেচা-কেনা চলত। একেই বলা হয় বার্টার বা বিনিময় প্রথা।

ধর, রামের একটা লাঙলের দরকার। সে হয়তো তার একটা বলদের বিনিময়ে শ্যামের কাছ থেকে একটা লাঙল পেতে পারে। কিন্তু শ্যামের যদি বলদের প্রয়োজন না থাকে তবে মুশকিল। তখন আবার রামকে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে, যে লাঙল বেচতে চায় এবং যার বলদের চাহিদা আছে। আবার লাঙলের চেয়ে যদি বলদের দাম বেশি হয়, তবে বলদটাকে ভেঙে তো আর খুচরো করা যাবে না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে মানুষ বেশ কিছুদিন ধান, চাল, লবণ, চিনি, তামাক ইত্যাদিকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে।

কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এসব মাধ্যমও অচল হয়ে পড়ল। তখন মানুষ এমন একটা মাধ্যমের কথা ভাবল সকলের কাছেই যার সমান মূল্য আর যার মাপকাঠিতে অন্য সব জিনিসের মূল্যও ঠিক করা যায়। সোনা, রূপা, ইত্যাদি ধাতুই হল এই মাধ্যম। ধাতুপিণ্ডের সাহায্যে শুরু হল কেনা-বেচা। কিন্তু এতেও অসুবিধা দেখা দিল। কারণ প্রত্যেক বারই এইসব ধাতুপিণ্ডগুলোকে ওজন ক'রে দেখতে হত। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবলে এই অসুবিধাও কাটিয়ে উঠল। চালু হল নির্দিষ্ট ওজন আর নির্দিষ্ট আকারের ধাতু-মুদ্রা।

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত লিডিয়াতে গ্রীকেরাই সর্বপ্রথম মুদ্রা তৈরি করে। মুদ্রা তৈরির রেওয়াজ গ্রীকদের কাছ থেকে এল ইতালী ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে। তারপর পারস্য ও ভারতে। পাশ্চাত্যদেশে মুদ্রার প্রচলন হবার কিছু পরে চীনেও মুদ্রা চালু হয়। চীন স্বাধীনভাবেই এই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করে, কারো অনুকরণে নয়। চীন থেকে এই রেওয়াজ আসে জাপানে ও কোরিয়ায়। রোমানরা আসবার আগেই বৃটেন মুদ্রা তৈরি করেছিল।

প্রাচীন রোমানরা প্রথমে জুনো মনিটা-র (Juno Moneta) মন্দিরে মুদ্রা তৈরি করেছিল। টাঁকশালের ইংরেজি প্রতিশব্দ Mint এই Moneta শব্দ থেকেই এসেছে।

অনুশীলনী

১। অভিধান দেখে মানে শেখো :

শ্রম, পণ্য, গো-ধন, বিনিময়, প্রথা, মাধ্যম, মাপকাঠি, ধাতুপিণ্ড, নির্দিষ্ট, ধাতু-মুদ্রা, তীরবর্তী, স্বাধীনভাবে, অনুকরণ, মুদ্রাঙ্কন, প্রতিশব্দ।

২। আগের দিনে যখন টাকা পয়সা ছিল না, তখন কি ভাবে মানুষ জিনিস পত্র কিনত ?

৩। টাঁকশালে কি তৈরি হয় ?

৪। খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতকে কারা, কোথায় প্রথম মুদ্রা তৈরি শুরু করে ?

৫। প্রাচীন রোমানদের কোন্ মন্দিরে মুদ্রা তৈরি শুরু হয়েছিল যার দরুন টাঁকশালের ইংরেজি প্রতিশব্দ হয় 'মিণ্ট্'?

৬। বাক্য রচনা করো :

খুচরো, মুদ্রা, বুদ্ধিবলে, মাপকাঠি, সোনা রূপা।

৭। শূন্যস্থান পূর্ণ করো :

(ক) শ্রম, ——, বা গো-ধনের —— তখন —— চলত।

(খ) রোমানরা —— আগেই —— মুদ্রা —— করেছিল।

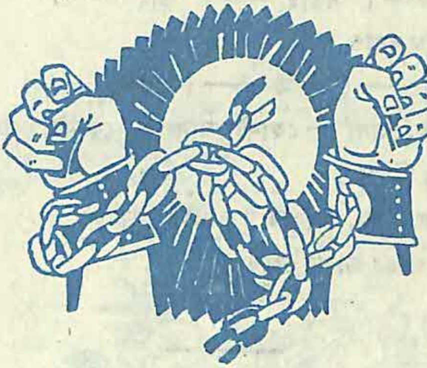
(গ) প্রাচীন ——রা প্রথমে জুনো ——র মন্দিরে —— তৈরি করেছিল।

৮। কোন্‌টি কি ধরনের বিশেষণ :

অন্য সব জিনিস ; **স্বাধীনভাবে** আরম্ভ করে ; **একটা মোটামুটি** ধারণা ; **প্রত্যেকবারই** দেখতে হত।

শিকল ভাঙার গান

অতুলপ্রসাদ সেন



পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই,
আপন কারায় বদ্ধ তোরা
পরের কারায় বন্দী তাই।
হারে মূর্খ! হারে অন্ধ!
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব ?
দেশের শক্তি করিস মন্দ
(তোদের) তুচ্ছ করে সবাই তাই।
সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই,
মন্দিরে মস্‌জিদে লড়াই ;
প্রবেশ করে দেখ্‌ রে দুভাই
অন্দরে যে একজনাই!

অনুশীলনী

১। মুখস্থ বলো।

২। মিল দাও :

দ্বন্দ্ব ——। বড়াই ——। ভাই ——।

৩। সমার্থক শব্দ বসাও :

নিগড় ——। শক্তি ——। অন্দর ——।

৪। 'সার' আর 'খোসা' — কোন্‌টা আসল ? কোন্‌টা খোলস ?

৫। কি ধরনের বিশেষ্য :

শিকল, দ্বন্দ্ব, মন্দির, লড়াই, বড়াই।

৬। কবিতাটি গদ্যের ভাষায় লেখো।

মৌমাছির নাচ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



মৌমাছিরা থাকে একসঙ্গে; কিন্তু মজা এই যে, পরস্পরের কথা বুঝতে পারা দূরে থাকুক, কথা তারা কেউ বলতেই পারে না। তারা কথা বলতে পারে না, তবুও তারা থাকে একসঙ্গে মিলেমিশে, পরম আনন্দে।

কেমন ক'রে থাকে? সে ভারি মজার উপায়। কথা বলতে না জানলেও ওরা জানে কেমন ক'রে মনের ভাব আর পাঁচজনকে জানিয়ে দিতে হয়; ওরা জানে মুখ বুঁজে, হল্লা না ক'রেও কেমন ক'রে জোর খবর দলের মধ্যে রটিয়ে দেওয়া যায়।

ধরো, একজন মৌমাছি একটা জব্বর খবর জোগাড় ক'রে আনলো। খবর যে জব্বর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; বনের মধ্যে, বাগানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছে একরকম ফুল—সে ফুলের মধ্যে মধু ভরতি। মৌমাছি অমনি করল কি — যতটা মধু তার পক্ষে একা একা বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব, ততটা মধু তুলে নিল ফুল থেকে নিজের

মুখে আর তারপর সোজা উড়ে চলল মৌচাকের দিকে। মৌচাকে পৌঁছে নিজের মুখের মধুটুকু আর একজন মৌমাছির মুখে তুলে দিল ভাঁড়ার ঘরে যত্ন ক'রে জমিয়ে রাখবার জন্যে—পরে সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

যত্ন ক'রে ভাঁড়ারে মধু তুলে রাখবার পর সে মৌচাকের ঠিক সামনে শুরু ক'রে দিল নাচতে। নাচ—সে ভারি অদ্ভুত নাচ, ভারি মনমাতানো নাচ! সে নাচের অদ্ভুত আকর্ষণ—সে নাচে নেশা আছে! তার অদ্ভুত নাচ দেখতে দেখতে স্থির হয়ে বসে থাকা যায় না। মৌচাকের বাকি মৌমাছিরাও তাই একটুক্ষণের মধ্যেই মেতে ওঠে—ঘর থেকে তারা বেরিয়ে পড়ে আর শুরু করে নাচতে।

এই ভাবে খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় প্রথম মৌমাছির পেছনে মস্ত বড় একটা দল জুটে গিয়েছে। দল যখন বেশ ভারী হয়ে ওঠে, তখন নাচতে নাচতে মৌমাছির দল ছোটে সেই ফুলের দিকে যে-ফুলের মধু আবিষ্কার হয়েছে।

তাই বলে এ কথাটা মোটেই সত্যি নয় যে, প্রথম মৌমাছি নেচে নেচে সঙ্গী জড়ো ক'রে সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ফুলের দিকে। আসলে, নাচের পর মৌমাছির দল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ফুলের সন্ধানে। নাচের অর্থ শুধু এই যে, কাছাকাছি ফুলে মধু পাওয়া গিয়েছে এই কথাটা মৌমাছি মহলে রাষ্ট্র ক'রে দেওয়া। কোন্ ফুলে মধু পাওয়া গিয়েছে তা ওরা বুঝবে কেমন করে?—নাচের সময় সারাক্ষণ প্রথম মৌমাছির গায়ে সেই ফুলের গন্ধ পেয়ে। তারপর, যখন জানা গেল কাছাকাছি অমুক গন্ধের ফুল আছে আর সেই ফুলে আছে মধু, তখন মৌমাছির দল এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল সেই ফুলের সন্ধানে।

মৌমাছি নাচে কেন বুঝতে পারলে আশা করি। মৌচাকের দিকে লক্ষ্য করলে মাঝে মাঝে দেখতে পাবে চাকের সামনে সবাই যেন ভিড় ক'রে হুল্লোড় করছে। ওটাই ওদের নাচ। বুঝবে, কাছাকাছি কোনও ফুলে ওদের মধ্যে কেউ মধুর সন্ধান পেয়েছে আর সেই খবর রটিয়ে দেবার জন্যে সমস্ত দলকে মাতিয়ে তুলছে।

অনুশীলনী

১। বাক্য রচনা করো :

মিলেমিশে, পরম-আনন্দে, জব্বর, ভাঁড়ার, মৌমাছি, মধু, আকর্ষণ, হুল্লোড়, মৌচাক, লক্ষ্য।

২। মৌমাছিরা দল বেঁধে মিলেমিশে থাকে বলে ওদের কি জাতীয় পতঙ্গ বলা হয় ?

৩। মৌমাছিরা কথা বলতে পারে না অথচ ফুলের বন খুঁজে পাবার জব্বর খবরটি ঠিক দলকে পৌছে দেয়। কেমন ক'রে ?

৪। মৌমাছিরা নেচে নেচে ফুলের মধু সংগ্রহ করে, না, নেচে নিয়ে যে যার ছড়িয়ে পড়ে মধুর সন্ধানে যায় ?

৫। একটি মৌচাক আঁকো।

৬। ফাঁক পূরণ করো :

(ক) মৌমাছির —— অদ্ভুত —— ; সে-নাচে —— আছে !

(খ) —— দল এদিক —— ছড়িয়ে —— ফুলের —— সন্ধানে।

(গ) ওদের —— কেউ —— সন্ধান ——, সেই —— রটিয়ে দেবার —— নাচ —— করে।

৭। কি ধরনের বিশেষণ :

অদ্ভুত আকর্ষণ ; **মনমাতানো** নাচ ; **ওদের** নাচ ; **ততটা** মধু ; **খাঁটি** মধু ; **প্রথম** মৌমাছি ; **একজন** মৌমাছি ; **উড়ন্ত** মৌমাছি।

কাব্যবীর

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



দেখ, হতে পারতাম নিশ্চয় আমি
মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন
মাথা রয় না স্থির।
আর ঐ বারুদটার গন্ধ
তেমন করি না পছন্দ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে
লাগে একটা ধন্দ।
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন
শিরোহীন এ স্কন্ধ।

তাই বাক্যে বীরই হয়ে রইলাম
আমি চ'টে ম'টেই তো।
তা নইলে খুব এক বড়ো—

হ্যাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো!

অনুশীলনী

১। মুখস্থ বলো।

২। লোকটা কেন কেবল বাক্যবীর হয়েই থাকল?

৩। মিল দাও:

ধন্ধ ——। বীর ——। চ'টে ম'টেই তো ——।
মস্ত ——। লাগে ——। নইলে ——।

৪। কোন্‌টা কি পদ লেখো:

শিরোহীন, পারতাম, বটে, গন্ধ, আমি।

৫। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীতটি মনে ক'রে বলতে পারো?

রূপসায়রী

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়



অনেকদিন আগে আবু বলে একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির তিন বছর বয়েস, কপালটা উঁচু, নাকটা খ্যাঁদা, বড় বড় চোখের মণি দুটোয় পেতলের রঙ আর গালে টোল পড়ে। চুলগুলো যেন একঝুড়ি বাদামী বটফল। আর গায়ের রঙ রাগলে লাল, ভয় পেলে নীল আর হাসলে মিঠে আলোর মত।

এহেন আবু থাকত সিঙ্গাপুর শহরে আর শহরটা ছিল মালয়ে। আর মালয় হল—এ-ই-ই পাঁচদিনের পথ।

এখন হয়েছে কি, আবু যে কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। সবাই বলছে—আহা, এমন পুতুলটি যে আবার জ্যান্ত!

পথে কত যে মানুষ। চীনে, মালাই, সাহেব, বাঙালী, অবাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান। সবাই জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁ মেয়ে, তোমার দেশ কোথা গো?'

আবু বলল, 'এখেনে।' বলে ঘট হয়ে বসে চেয়ে রইল।

'তোমার মা কোথায়?'

'এখেনে।'

'মাকে হারিয়ে ফেলেছ?'

'উঁহু।'

'তবে?'

'মা যে আমায় খুঁজেই পায় নি।'

বলে আবু তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর হাসল। আর তার টোল-খাওয়া গালে মিষ্টি মিষ্টি রং ফুটে উঠতেই একজন ছুটে এসে ওকে কোলে নিয়ে বললেন—'ওমা! তোকেই যে আমি সারাজীবন খুঁজছি!'

আবু আরও চেয়ে থেকে বলে উঠল—'তাহলে তুমিই আমার মা।'

কাজেই আবুর মা পাওয়া গিয়েছে দেখে ভিড়ের লোকেরা খুশি হয়ে যে যার চলে গেল।

আর আবুর মা সারাজীবন ধরে হাঁটাহাঁটি ক'রে ক'রে শেষে এমন আবুকে পেয়ে সমুদ্রের ধারে তাঁর কুঁড়েঘরে গিয়ে খুশিতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যে হলে আবু যখন তার কচি আধো গলায় গান ধরে, তখন সেই গানের সুর শুনে আবুর মায়ের দুচোখ বেয়ে জল পড়ে— এ গান ও মেয়ে কোথায় শিখল! কেন না, এ গান গাইলেই দূরের চর পেরিয়ে দেখা যায় আবুর সাইরেন আর মারমেড দিদিরা এসে হাজির হয়েছে। দেখা যায়, আবুর ক্ষুদে রাজপুত্তুর সাগরদাদাকে। আর দূর, আরও

দূরের মাথা-পাগল কালাপানিদাদার শান্ত মুখগুলো ছলছল করছে। আরও দূরে, আরও আরও দূরে, সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে, এপাশে ওপাশে, কারা সব বসে গেছে গান শুনতে। কচি গলার গান!

আবুর মা সব দেখতে পান। ভাবেন, এ মেয়ে কোথা থেকে এল?

অনুশীলনী

১। আবু বলে মেয়েটিকে দেখতে কেমন ছিল?

২। আবু যে শহরে থাকতো তার নামটা কি আর সেটা কোন্ দেশের শহর?

৩। 'আহা, এমন পুতুলটি যে আবার জ্যান্ত'—কথাটা কার সম্বন্ধে এবং কেন?

৪। আবু তার 'মা'-কে খুঁজে পেল কি ক'রে?

৫। আবুর গান শুনে কারা আসত? মায়ের চোখ বেয়ে জল পড়ত কেন?

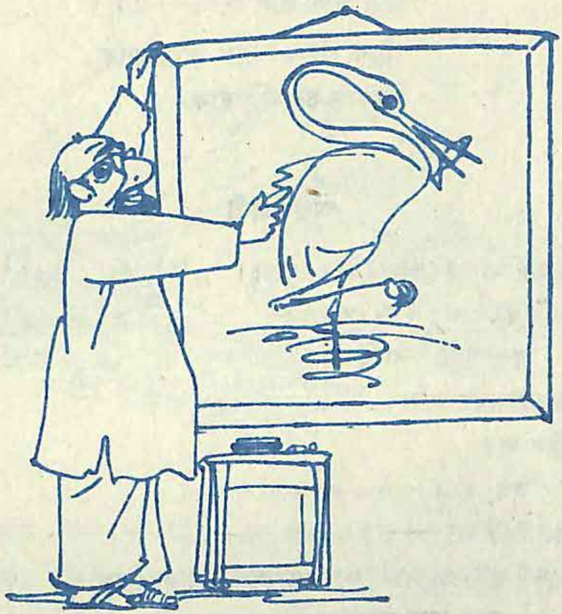
৬। সমুদ্রের ধারে বসে কচি গলায় গান শুনতে যারা আসত তাদের নিয়ে একটা ছবি আঁকো।

৭। বাক্য রচনা করো:

টোল খাওয়া গাল, মিষ্টি, সারাজীবন, ক্ষুদে রাজপুত্তুর, কালাপানি।

চকখড়ি

অন্নদাশঙ্কর রায়



চকখড়ি চকখড়ি চক
এইবার আঁকছি বক
বক মামা বক মামা — খপ
খপ ক'রে মাছ খায় — ঝপ।

ঝপ ক'রে উড়ে যায় বক
চকখড়ি চকখড়ি চক।

চকখড়ি চকখড়ি চক
এইবার আঁকব কাক।

কাক নয় শাদা, তাই হাঁস
হাঁস হলো হাঁস হলো — ব্যস্।
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডাক
চকখড়ি চকখড়ি চাক।

অনুশীলনী

১। চকখড়ি দিয়ে তোমার নাম লেখো।

২। ছবি খুঁজে বার ক'রে দেখাও :
বক, মাছ, কাক, হাঁস।

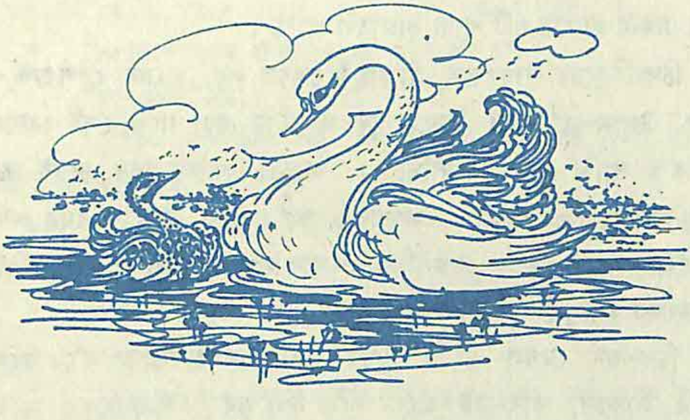
৩। ছড়াটি মুখস্থ বলো।

৪। মিল দাও :
ঝপ্ ক'রে ——; বক মামা ——;
উড়ে যায় ——; চকখড়ি ——।

৫। একটি কর্তা ও একটি ক্রিয়া দিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো :
(যেমন, মামা আসছেন।)

চিক্-চিক্

নবনীতা দেব সেন



নভেম্বর মাস হতে না হতেই ওরা এসে পড়ে। সেই উলান-বাটোর থেকে উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে আসে আলিপুর চিড়িয়াখানার এই পুকুরে। চিক্-চিক পুক্-পিক টুং-টুং লুং-পুং সব্বাই সব্বাই……তাদের বাবা-মা খুড়ো জেঠা মামা মাসী মেসো দাদাঠাকুদ্দা সক্কলে মিলে ……উড়ে যায় — তাদের যে শীতকালে দক্ষিণে বাতাসে চেঞ্জে যাবার সময় হয়েছে।

মঙ্গোলিয়া থেকে সাইবেরিয়ার বরফ পার হয়ে চীন — তারপর মাঞ্চুরিয়া পেরিয়ে, সোভিয়েৎ রুশিয়ার ওপর দিয়ে জর্জিয়া, তাজিকীস্তান, উজবেকিস্তান সমস্ত পেরিয়ে ওরা উড়ে আসে, কাবুলের মেওয়া ক্ষেতের ওপর দিয়ে তিব্বতের লামাদের মঠের ওপর দিয়ে হিমালয় পাহাড় পেরিয়ে, এভারেস্ট চুড়োর ওপর দিয়ে, ওরা উড়ে আসে।

এমন কি ওই যে একবছরী খুকু খুক্-খিক্, সেও এসেছে। চিক্-

চিকও এসেছিল একবছর বয়সে। এখন তার দু'বছর। এর মধ্যেই সে তিনবার এভারেস্টের মাথার ওপর দিয়ে এপার-ওপার ডিঙিয়েছে।

লক্ষ লক্ষ পাখির কলরবে আলিপুর চিড়িয়াখানার দীঘির বাতাসে যেন সেতার বাজছে। জলটল প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ক্ষুদে ক্ষুদে বিদেশী পাখিতে পাখিতে দীঘির রুপোলী গা-টা ভর্তি হয়ে গেছে, ঠিক যেন একটা হাজার বুটি শাদা টাঙ্গাইল শাড়ি।

চিক্-চিক্‌দের পাড়াশুদ্ধু গাঁশুদ্ধুই কেবল নয়, ওদের দেশশুদ্ধু— মাছে উলান-বাটোরের উত্তরে যে জলাটায় ওরা থাকে, সেই জঙ্গলের সব ক'টা পাখি এখন এই দীঘিতে। অন্ততঃ একশো বছর ধরেই ওরা উড়ে আসছে এইখানে। একবারও পথ ভোলে না। যেমন আসে তেমনি আবার ফিরে যায় ঠিক—লক্ষ লক্ষ যোজন পথ পেরিয়ে, নিজেদের জলে, নিজেদের জঙ্গলে।

চিক্-চিক্ দেখল একটা সুন্দর মতন পোকা তিড়িং ক'রে জলের ওপর লাফাল, তারপরই জলের মধ্যে দিল ডুব! চিক্-চিক্‌ও ডাইভ দিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উ-হু-হু-হু-হু!! গেছি!! গেছি!! চিক্-চিকের মাথাটা কার মাথার সঙ্গে যেন ঠুকে গেল! অমনি চিক্-চিক্ শুনতে পেল ভারী গলায় কে যেন বললেন—'আহা-হা! ষাট! ষাট! লাগলো বুঝি? আমি দেখতে পাইনি বাছা।'

চিক্-চিক্ মুখ তুলে চেয়ে দেখে ইয়া লম্বা চওড়া বিশাল বপু শালপ্রাংশু মহাগ্রীব এক রাজহাঁস। রেশমের মতো কুচকুচে কালো তাঁর গায়ের রং, টুকটুকে লাল তাঁর ঠোঁট। ঐ পোকাটার জন্য ডুব দিয়েছিলেন রাজহাঁসও।

রাজহাঁস বললেন—'তোমার মাথায় কি খুব বেশি লেগেছে?'

চিক্-চিক্ বলল,—'না-না।'

রাজহাঁস তখন তাকে একটি রস টুসটুসে কচি পোকা খেতে দিলেন। —'না-না' বলতে বলতে চিক্-চিক্ সেটা খেয়ে ফেলল। এমনি ক'রে দুজনে বেশ ভাব হয়ে গেল।

অনুশীলনী

১। উলান-বাটোর কোথায় ?

২। সাইবেরিয়া আর মঙ্গোলিয়া থেকে কলকাতার চিড়িয়াখানায় কেন এই পাখিরা আসে ?

৩। কলকাতার চিড়িয়াখানায় 'রেশমের মতো কুচকুচে কালো রং আর টুকটুকে লাল ঠোঁট'-ওয়ালা যাদের দেখতে পাও তারা কী ধরনের পাখি ?

৪। চিক্-চিকের সঙ্গে রাজহাঁসের কী ক'রে ভাব হল ?

৫। বাক্য রচনা করো :

(ক) চিক্-চিক্ (খ) তিব্বত (গ) এভারেস্ট (ঘ) টাঙ্গাইল (ঙ) চিড়িয়াখানা।

৬। সাইবেরিয়া আর মঙ্গোলিয়া থেকে যে সব পাখি দল বেঁধে উড়ে আসে আমাদের দেশে, তাদের চিড়িয়াখানায় যেমন দেখেছ, তেমনি বর্ণনা করো।

৭। পাখির দল কোন্ কোন্ দেশ ও পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে আসে ?

৮। এক কথায় লেখো :

হাওয়া বদল করতে বাইরে যাওয়া ; যার এক বছর বয়স হয়েছে ; যেখানে সন্ন্যাসীরা থাকেন ; শালগাছের মতো লম্বা দেহ ; চারক্রোশ পরিমাণ দৈর্ঘ্য।

৯। নিচের বিশেষণগুলির উপযুক্ত বিশেষ বসাও :

কুচকুচে —— ; টুসটুসে —— ; চকচকে —— ; ধবধবে —— ; টুকটুকে —— ; থকথকে —— ; ছটফটে —— ; খট্‌খটে ——।

দুপুর বেলা

পূর্ণেন্দু পত্রী

দুপুর বেলা রোদের ঝামটা কড়া ;
হাওয়া নেইকো, গাছপালা মন-মরা।
খেজুর গাছের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
কাঠবিড়ালী মুখ লুকিয়ে লাফায়।
নেড়ী ছাগল দু'ঠ্যাং তুলে গন্ধ শুঁকে বেড়ায়
কচি পাতা ফুটেছে কোন্ গাছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে আগে পাছে
পিছনে ফেলে বাবুর বাড়ির গোলা
দেখতে পেলো তিনকড়িদের দরজাখানা খোলা।
গেবো সটান ঢুকে পড়ল ঘরে।
নাক ডাকছে ভোঁ-ভপ্ ভপ্
ঘাম ঝরছে গা ছপ্ ছপ্
বাড়িশুদ্ধ ঘুমিয়ে গেছে মরে।

অনুশীলনী

১। গেবো দুপুরে বেরিয়ে কী কী দেখল ?

২। মিল দাও : গাছে ——। কড়া ——। গোলা ——।

৩। কচি, ঘাম, খোলা, সিঁড়ি — একেকটি শব্দ দিয়ে একেকটি বাক্য তৈরি করো।

একানড়ের ছুরি

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়



এক যে ছিল একানড়ে
সে থাকে তালগাছে চড়ে।

ববির বয়েস যখন সাড়ে তিন, তখন তার দুষ্টুমির চোটে কেউ আর পেরে উঠছিল না। বেশি রাগ হলে ঠাকুমা বলতেন, 'আয় ত রে একানড়ে ঠান্দি, ববিকে ধরে নিয়ে যা।' ববি লম্ফঝম্প ক'রে বলত, 'একানড়ের ঠান্দিকে আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে হেলিকপটারে চড়িয়ে রাঁচী পাঠিয়ে দেব।' রাঁচীতে ববির জেঠু থাকেন। ববি কখনো যায়নি ; তাই কাউকে অনেক দূরে সরিয়ে দেবার দরকার হলে ববি তাকে রাঁচী পাঠিয়ে দিত। ঠাকুমা তখন চুপি চুপি গোপালকে বলেন, 'যা ত গোপাল, পাঁউরুটি-কাটা ছুরিটা নিয়ে জানলার বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে একটু একটু ক'রে ঢোকা আর শার্সি নেড়ে ঘটাঘট আওয়াজ কর্।' গোপাল একানড়ে সেজে বাইরে থেকে ছুরি ঠকঠক করলেই ববি এক্কেবারে ঠাণ্ডা।

এমনি ক'রে দিন যাচ্ছিল। প্রায়ই রোজই দু-তিনবার ক'রে একানড়ের ছুরি দেখা যায় আর ববি সেই দেখে খানিকক্ষণের জন্যে দুষ্টুমি থামিয়ে লক্ষ্মী হয়ে থাকে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? সাইকেল শুদ্ধু সিঁড়ি দিয়ে নামবার চেষ্টা করা, দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে লেখা, গোপালকে ব্যাট দিয়ে পেটানো, যখন-তখন 'রসগোল্লা খাব' বলে বায়না করা, দুপুরে ঘুমোতে না চাওয়া, এইরকম সব খারাপ খারাপ কাজে ববির সারাদিন কাটত।

একদিন বিকেলের দিকে ববি যখন ছোট ভাই বিলির সঙ্গে মারামারি করছে, ঠাকুমা চেয়ারে বসে গোপালকে বকাবকি করছেন, এমন সময় শোঁ শোঁ হুড়মুড়-দুড়দাড় ক'রে ভীষণ ঝড় এসে সব দরজা জানলা পটাপট ক'রে বন্ধ হয়ে গেল। ববি তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে গেল ঠাকুমার কাছে—'ঠাকুমা, ঠাকুমা! আমার আর বিলির মুখের মধ্যে কি ঢুকে গেল?'

'ওটা ধুলো ঢুকে গেছে, মানিক।'

'কী ক'রে ধুলো এল?'

'ঝড়ের সঙ্গে।'

ববি এর আগে কখনো ঝড় দেখেনি। আরো ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কী ঝড়? কী ঝড়? ঝড় কোথা থেকে এল?'

ঠাকুমা দেখলেন—এই সুযোগ! বললেন, 'ওমা, তাও জানো না? তিনটে একানড়ে হুড়োহুড়ি ক'রে মারামারি করতে করতে এসে সব দরজা-জানলায় ধাক্কা দিয়ে গেল। তাকেই বলে ঝড়।'

ববি শুনে একটু গম্ভীর হয়ে রইল।

তারপরের দিন সকাল থেকেই ববি বাঘ হয়ে গেছে। মা বললেন, 'এসো ববি, দাঁত মাজা হবে।' ববি বললে, 'ঘেঁয়াও।' মা আবার বললেন, 'এসো, এসো, ওকি পাগলামি হচ্ছে!' ববি 'হালুম, হালুম' বলে হামাগুড়ি দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল, সেখানে লছমন রুটি টোস্ট করছিল—গিয়েই পায়ে এক কামড়।

অনুশীলনী

১। 'এক যে ছিল একানড়ে।

সে থাকে তালগাছে চড়ে।'

এই তালগাছে-চড়া একানড়ে-ঠান্‌দিকে ভয় দেখানর জন্যে ডাকলে ববি তাকে কি পালটা ভয় দেখাতে চাইত ?

২। গোপাল একানড়ে সেজে ছুরি ঠক্ ঠক্ ক'রে শেষে ববিকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছিল কি ?

৩। ববির দুষ্টুমির গোটা তিনেক বিবরণ দাও।

৪। ঠাকুমা ববির কাছে ঝড়কে কাদের মারামারি বলে ব্যাখ্যা করলেন ?

৫। সব কিছুর পরও ববি যখন লছমনের পায়ে এক কামড় বসাল তখন ববির স্বভাবটা শান্ত না অশান্ত, চঞ্চল না ধীর, দুষ্টু না ভালো বলে মনে হয়েছে ?

৬। বাক্য রচনা করো :

ঘটাঘট, পেটানো, বকাবকি, দুড়দাড়, মারামারি।

৭। বিপরীত শব্দ লেখো :

বাইরে, যাচ্ছিল, নামবার, বন্ধ, এসো।

৮। কোন্‌গুলি বিশেষণ পদ, দাগ দাও :

ভীষণ ঝড় ; খারাপ কাজ ; ববির জেঠু ; পাঁউরুটি-কাটা ছুরি ; এক্কেবারে ঠাণ্ডা।

ব্যাঙসাহেবের নাতি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ব্যাঙসাহেবের নাতি
মস্ত একটা হাতি
পুষতে পারে কেউ যদি দেয়
ছোট্ট একটা খাঁচা,
কিংবা তাকে কেউ যদি দেয়
বানিয়ে একটা মাচা ॥

ব্যাঙসাহেবের নাতি
দেখতে কেমন হাতি
দেখেইনিকো, পায় যদি সে
উড়ুক্কু লাল ঘোড়া
পুষতে পারে পাগড়ি বেঁধে
জরির ঝালর মোড়া ॥

ব্যাঙসাহেবের নাতি
ফোলায় বুকের ছাতি
ঝমঝমিয়ে বিষ্টি এলে
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
ঝলমলিয়ে চাবুক হাঁকায়
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকে ॥

অনুশীলনী

১। প্রথম দু ছত্র মুখস্থ বলো।

২। খাঁচা, মাচা, পাগড়ি — কি বলো তো?

৩। মস্ত, ছোট্ট, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর — এই একেকটি শব্দ দিয়ে একেকটি বাক্য বানাও।

বারো মাসে তেরো পার্বণ

রবীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার



পাল-পার্বণ — মানে, পালা ক'রে ক'রে যে সব পর্ব ঘুরে ঘুরে আসে। আর, নানারকম আচার-বিধির মধ্যে দিয়ে সবাই মিলে সেগুলি পালন করি। পর্ব বা পরব — অর্থাৎ, উৎসব।

এই সব পাল-পার্বণের অনেকগুলিই মানুষের সমাজে চলেছে বহু বহুকাল ধরে। কতকাল আগে যে এদের চলন, সে সম্বন্ধে ধারণা করা মুশকিল। হাজার হাজার বছর আগেকার সেই যে মানুষ, সেই মানুষদের কাছে দু'টি জিনিস ছিল গুরুতর। তাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার গোড়ায় ছিল এই দু'টি জিনিস। বেঁচে থাকার জন্যে, প্রাণ-ধারণের জন্যে সেই আদ্যি কাল থেকে বরাবর মানুষ এই দু'টি জিনিস সবচেয়ে বড় দরকারী

বলে বুঝে এসেছে। এই দু'টি জিনিসের একটি হচ্ছে রোজকার খাবার। আরেকটি হচ্ছে ছেলেপুলে। দিনকে দিন প্রাণ-ধারণের জন্যে আহার চাই, খাদ্যের জোগাড় চাই। আর নিজেকে সমাজকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে ছেলেপুলে চাই, ঘরে ঘরে সন্তান চাই। দিনকে দিন আহার জোগাড় করতে হবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। আর, নিজেদের ধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে চাই সন্তান, যাতে কিনা আমরা না থাকলেও আমাদের পরে মানুষের সমাজটি ঠিক থাকে। জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলার জন্যে, আনন্দ সৃষ্টি ক'রে নেবার জন্যে আরও অনেক কিছু মানুষ বানিয়েছে। কিন্তু এই দু'টি জিনিস থেকে গেছে তার একেবারে গোড়াকার তাগিদে—বেঁচে থাকবার, টিকে থাকবার তাগিদে।

আদ্যিকালের সেই মানুষরা লক্ষ্য করেছিল যে, বছরে বছরে প্রকৃতির পালা-বদলের সঙ্গে তাদের আহার জোগাড়ের ব্যাপারটার একটা সরাসরি যোগ আছে। বছরে বছরে ঋতুগুলি ঘুরে ঘুরে আসে। আর, সেই সঙ্গে পালা ক'রে ক'রে তারা যে সব জিনিস খেয়ে প্রাণ বাঁচায়, সেই সব জিনিসগুলি কখনও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, আবার কখনও একেবারে মেলে না। এক সময়ে মানুষ শুধু জন্তু-জানোয়ার শিকার ক'রে তাদের মাংস খেয়ে আর গাছ-গাছালির ফলমূল খেয়ে প্রাণ বাঁচাত। বছরের কোনো এক বিশেষ সময়ে এই সব জন্তু-জানোয়ারেরা সংখ্যায় বেড়ে ওঠে আর গাছে গাছে প্রচুর ফল ধরে। তারপর মানুষ ফসল বুনতে জানল। ধান রুইতে শিখল, তরি-তরকারির ব্যবহার জানল। বছরের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে এই শস্য আর খাবার উপযোগী শাক-তরকারি একেবারে পাওয়া যায় না; আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে এ সব খুব বেশি রকম মেলে।

এই বিশেষ সময়গুলি তাই তখনকার মানুষের পক্ষে বিশেষ একটা মানে পেল। প্রাণ-ধারণের জন্যে এই সব ঋতু তাদের সাহায্য করছে বলে বুঝতে পেরে তারা এই সব ঋতুতে আনন্দ-উৎসব করতে লাগল। আরও তাড়াতাড়ি যাতে এই সব ঋতু ঘুরে আসে তার জন্যে সবাই

মিলে নানাভাবে মনের কামনা জানাতে থাকল। আবার বছরের যে সময়টাতে ভালো মতো খাবার জুটবে না, শরীরের কষ্ট সইতে হবে, সেই সব দিনগুলো যাতে তাড়াতাড়ি কেটে যায়, সেই কামনা থেকেও নানা-রকম অনুষ্ঠান। তাই পর্বে পর্বে পালা ক'রে উৎসব-অনুষ্ঠান। তাই পালা-পার্বণ। বছরে বছরে ঘুরে ঘুরে তাই এক-এক সময়ে এক-এক রকম রীতি-নীতি। প্রকৃতির পালা-বদলের সঙ্গে মানুষের বাস্তব জীবন-ধারার পালা-বদল এইভাবেই হয়।

অনুশীলনী

১। অভিধান দেখে মানে বলো :

পালা, পার্বণ, উৎসব, আচার-বিধি, গুরুতর, প্রাণ-ধারণ, সৃষ্টি, আদ্যিকাল, পালা-বদল, রীতি-নীতি, প্রকৃতি, বাস্তব।

২। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কথাটা কেন বলা হয়?

৩। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বেঁচে থাকার জন্যে কোন্ দু'টি প্রধান জিনিস সব চাইতে দরকারী বলে জেনেছে?

৪। আদ্যিকাল থেকে মানুষ ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থার বদল কী ভাবে বুঝেছিল?

৫। প্রাণ-ধারণের জন্যে যে সব ঋতু বেশি সাহায্য করে, সেই ঋতুতে মানুষ কী করে?

৬। বাক্য রচনা করো :

প্রচুর, ফসল, আনন্দ-উৎসব, ঋতু, ঘুরে ঘুরে।

৭। নিচের ক্রিয়াপদগুলির একটি ক'রে সমাপিকা রূপ লেখো :

ঘুরে, সইতে, জানাতে, ক'রে বুঝে, করতে, খেয়ে, পাওয়া।

যমুনাবতী

শঙ্খ ঘোষ

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে !
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।

হায়, তোকে ভাত দিই কি ক'রে যে ভাত দিই হায় !
হায়, তোকে ভাত দেব কি দিয়ে যে ভাত দেব হায়!

নিভন্ত এই চুল্লী তবে
একটু আগুন দে—
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে !
দু'পারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দী
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দি' !

বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায়!
ধার-চক্‌চকে থাবা দেখছ না হামলায় ?
যাস্‌নে ও-হামলায়, যাস্‌নে !!

অনুশীলনী

১। প্রথম ছ'ছত্র মুখস্থ বলো।

২। কবিতায় অন্ত্যমিলযুক্ত শব্দগুলো লেখো।

৩। অভিধান দেখে মানে জেনে নাও :

নিভন্ত, চুল্লী, হাতিয়ার, বর্গী, হামলা।

মিতালি

সুকুমার দে সরকার



বট, অশথ তেঁতুল, আশশেওড়া গাছগুলো গলাগলি ভাব ক'রে বড় হয়েছে। তাদের পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে সবে মেটে মেটে আলো উঁকি মারছিল! হঠাৎ কলুদের খোকা কেঁদে উঠল। অশথ গাছের বুড়ো কাকটা ডানা ঝটপট ক'রে জেগে উঠল; ছাতারে পাখিটা চোখ মেলে বলল — কট্ টক্ টক্ করর্ কঃ।

কালো বেড়ালটা পা টিপে টিপে ছোট্ট টুনটুনি যেখানে ঘুমচ্ছিল সে দিকে এগচ্ছিল। তার চোখ দুটো জ্বলছিল যেন ভাঁটা। খোকা আবার কেঁদে উঠল। আর দুটো ছাতারে পাখি জেগে বলল — টক্ টক্ করর্ করর্।

বুড়ো কাকটা বলল — কা-আ-আ।

কালো বেড়ালটার পা গেল ফসকে, ছোট্ট টুনটুনি জেগে ফুড়ুৎ ক'রে

উড়ে গেল। একটুখানি ঝিরঝিরে হাওয়া এসে গাছের পাতাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল। তারা মাথা দুলিয়ে বলল — খোকা উঠেছে ?

খালি আশশেওড়া গাছের পাতাগুলোর মধ্য থেকে লক্ষ্মী পেঁচা তার ডানার পালকের মধ্যে ঠোঁটটা গুঁজে গোল গোল চোখ দুটো বুজতে বুজতে বলল — আরে ছোঃ, এতক্ষণ আলো ছিল, যেই অন্ধকার হ'তে শুরু হয়েছে, অমনি লোকগুলো গোলমাল শুরু করেছে। যত সব, হ্যাঃ—

খোকার মা বলল — কাল অনেক রাত অবধি ধান ভেনেছি, খোকা একটু ঘুমুতে দে।

খোকা যখন হামা দিয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে এল, বুড়ো কাকটা বলল— ক্কঃ, অর্থাৎ কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? এত দেরি !

খোকা বলল — ম্-ম্া, অর্থাৎ মা যে ঘুমুচ্ছে।

ছাতারেরা টক্ টক্ কর্‌র্ ক'রে বলল — দুয়ো খোকা, দুয়ো !

টগর গাছের একটা নরম ডালে বসে দুলতে দুলতে ছোট্ট টুনটুনি বলল—বা রে, খোকাই ত সবচেয়ে আগে উঠে কাঁদল, আর তাই ব'লেই ত যম বেড়ালটার পা ফস্‌কে গেল আর আমি বেঁচে গেলাম, নইলে—

খোকা বললে — তা-তা-তা অর্থাৎ তাইত !

খোকার সাড়া পেয়ে গোয়ালের ভেতর থেকে বাছুরটা ডেকে উঠল— ম্বা-মা-আ-আ। বেচারী বাঁধা আছে, বেরুতে পারে না। খোকা বলল —ম-ম-ম্মা, অর্থাৎ দাঁড়া, মা উঠে খুলে দেবে।

এমন সময় কালো বেড়ালটাকে সেদিকে আসতে দেখা গেল। মিশ-মিশে কালো রং, চোখ দুটো তামাটে, জ্বলছে যেন ভাঁটা, সে খোকার দিকে একবার চেয়ে — ভর্‌র্ ফ্যাচ !

খোকাদের মজলিস ভেঙে গেল। বুড়ো কাক বলল — যাইগে বেলা হল, পেটের চিন্তা করিগে; বোসেদের বাড়ি কাল খাওয়ান দাওয়ান হয়েসে, পাতা-টাতা অনেক ফেলেসে বোধ হয়।

ঘাড়টা বেঁকিয়ে কটকট ক'রে বেড়ালটার দিকে চেয়ে বুড়ো কাক উড়ে গেল।

ছাতারেরা বলল — খোকা, তোমার বাবার ঘানি গাছে উই ধরেছে, সেগুলো সাবাড় ক'রে আসি।

ছোট্ট টুনটুনি ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে যেতে যেতে বলল — খোকা, বাদার বিলে অনেক দূর থেকে সব হাঁসেরা এসেছে। তারা নাকি তীর্থ করতে যাচ্ছে মানস সরোবরে, তাদের কাছে বিদেশের খবর শুনে আসি। তোমায় বলব।

খোকার মা এসে বললেন — খোকা, দুধ খাবি আয়।

অনুশীলনী

১। টুনটুনি পাখির বাসার দিকে পা টিপে টিপে কালো বেড়ালটাকে এগোতে দেখে, খোকা, ছাতারে পাখি, কাক — সব কে কীভাবে ডেকে উঠল ?

২। দিনের আলো ফুটতেই লক্ষ্মী পেঁচা কেন বলল যে, তখন অন্ধকার ?

৩। খোকার মজলিসে কারা রোজ জমিয়ে বসত ?

৪। যে সব হাঁসেরা তীর্থ করতে অন্য দেশ থেকে উড়ে মানস সরোবরে আসত ছোট্ট টুনটুনি তাদের কাছ থেকে খোকার জন্যে কী সংগ্রহ করতে যেত ?

৫। খোকার মত তোমারও কী নানা রকম প্রাণীর সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করে ?

৬। নিচের অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির সঙ্গে উপযুক্ত সমাপিকা ক্রিয়াপদ দিয়ে বাক্য তৈরি করো :

ক'রে, কেঁদে, টিপে, জেগে, দুলিয়ে, ঘুমুতে, উঠে, আসতে, বেঁকিয়ে।

অতি-কিশোরের ছড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য

তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাও না যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চুনকালি,
কোনো কাজটাই পারি নাকো ব'লতে পারি ছড়া,
পাসের পড়া পড়ি না ছাই পড়ি ফেলের পড়া।
তেতো ওষুধ গিলি নাকো, মিষ্টি কিংবা টক
খাওয়ার দিকেই জেনো আমার চিরকালের শখ।
বাবা-দাদা সবার কাছেই গোঁয়ার এবং মন্দ
ভালো হ'য়ে থাকার সঙ্গে লেগেই আছে দ্বন্দ্ব।
প'ড়তে ব'সে থাকে আমার পথের দিকে চোখ,
পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশি ঝোঁক।
হুলের কেয়ার করি নাকো মধুর জন্যে ছুটি,
যেখানে ভিড় সেইখানেতেই লাগাই ছুটোছুটি।

অনুশীলনী

১। এক কথায় বলো :

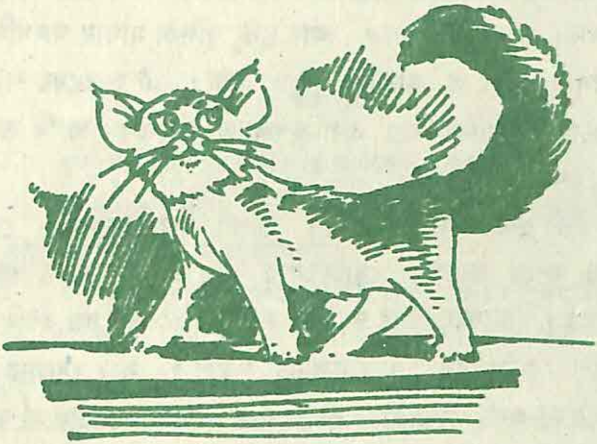
যার নজর শুধু খাওয়ার দিকে ; যে কোনো কাজের নয় কেবল নিন্দে করে।

২। বিপরীত শব্দ লেখো :

মন্দ ——। নির্জন ——। মিষ্টি ——।

কন্

রুনু চট্টোপাধ্যায়



কন্ যে জাতে বেড়াল, সে কথা অনেক দিন পর্যন্ত জানত না ও। অনেক দিন আয়নার সামনে বসে নিজেকে দেখেছে। মনে হত মা, বাবা, দিদির চেয়ে একটু যেন ফরসা। অমন ত কত লোকেরই হয়ে থাকে, ঐ যে কুকুল। ওর ত মা-বাবা ফরসা নয়, তাই বলে কি কুকুল ওদের ছেলে নয়? ঐ সব কথা কন্ আয়নার সামনে বসে ভাবত আর মুখটা এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে দেখত। আর চোখটা? চোখটা ত সত্যি সত্যি অশোকাভিচের মত। তবে? এই সব কথা মনে হত কারণ মাঝে মাঝে বাবা মার কথার টুকরো কানে আসত যে!

লোকে বেড়াতে এলেই বাবা-মা আদিখ্যেতা করে কন্‌কে নিয়ে যেত, দেখাতে! তারপর বলত, ঐ ত আল্‌সেতে এইটুকুনি ছোট্ট বেড়ালটা পড়ে ছিল। কত কাণ্ড ক'রে তুলে এনে খরগোশের দুধ খাইয়ে মানুষ করা হল ওকে। কেউ যদি বলত, নাম কি? বলা হত— কন্, মানে

ক আর ন। বাবা ত আবার কনের চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে থাকা, কান নাড়ানো, ল্যাজ নাড়ানো এইসব দেখাত।

রাত্তিরে শুয়ে জানলা দিয়ে একটা মিটমিটে দুষ্টু তারার দিকে তাকিয়ে কনের যেন কেমন দুষ্টুমি পেত। মনে হত এমনি নিস্তব্ধ রাতে কারনিস দিয়ে পাশের বাড়ির জানলায় গিয়ে দেখলে কেমন হয়? ওদের ঘরগুলো কেমন, কে কে আছে? আর দুষ্টু বুদ্ধিটা মাথায় গজগজিয়ে উঠল একদিন। ভারি ত কারনিস দিয়ে হাঁটা! ঐ ত ওদের বাড়ির মণ্টুকে দেখেছে পাঁচিল দিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ি করতে। ও কি তাতে বেড়াল হয়ে গেল?

ওমা! কী সুন্দর ঘরটা ওদের! দোলা আছে একটা। ছোট্ট বাচ্চা শুয়ে আছে তাতে। ছোটবেলায় ওকেও ত মা অমনি শুইয়ে রাখত দোলায়। আচ্ছা, এখন ত সত্যি সত্যিই ও তেমন বড় হয়নি— দোলায় শুলে কেমন হয়, ঐ ছেলেটার পাশে? সবে দোলায় কন্ লাফিয়ে উঠেছে, অমনি ছেলেটার কী কান্না! আর ছেলেটার মা ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বিল্লি বিল্লি!' ছেলেটার গালে আস্তে একটা চড় মেরে বাড়ি ফিরে এল কন্। বাব্বাঃ, ছেলেটার মা'র কি ক্যানক্যানে গলা! আর বিল্লি-বিল্লি বলে চেঁচানোই বা কেন? কে জানে বিল্লি মানে কি? বেড়াল নয় ত?

দুপুরবেলাগুলো কনের ভারি একা একা লাগত। বাবা আপিস যায়, মা ঘুমোয়, দিদি পড়ে। জানলা দিয়ে দেবদারু গাছের মাথা ঝাঁকানো, পাশের উঠোন, কাকগুলোর কারনিসের পাশে চুপচাপ বসে থাকা— এইসব দেখা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না কনের। রোদ্দুরে বাইরে বেরুলে মা যে আবার বকে।

এমনি এক দুপুরে জানলার ধারে বসে কন্ পাশের বাড়ির উঠোনে গাড়ি সারানো দেখছিল। হঠাৎ জানলার ওপাশে কারনিসে কে যেন বলে উঠল, 'কী রে, তুই এখানে থাকিস নাকি?' কারনিসের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা কালো-সাদা-ছাপওয়ালা বেড়াল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

কন্ বলল, 'কে রে তুই, এখানে এসেছিস কেন? দুধ আছে যে আঢাকা। পালা!'

কনের কথা শুনে সেই বেড়ালটার কী হাসি! অনেকক্ষণ দুলে দুলে হেসে বলল, 'ও তুই তাহলে বেড়ালতপস্বী! যা যা সব দেখি, কোথায় দুধটা আছে? আয় না বরং ভাগাভাগি ক'রে খাই দুজনে।'

অনুশীলনী

১। কন্ যে বেড়াল সে কথা তার ভাবতে খুব অসুবিধে হত। কেন?

২। তোমার যদি কনের মতো কোন বেড়াল বা কুকুর থাকত, তাহলে তুমিও কী তাকে এমনি 'মানুষ' ক'রে তুলতে?

৩। কথায় বলে জীবজন্তু পুষতে হলে জীবজন্তু হতে হয়। কথাটা তুমি মান?

৪। কনের কী কী গুণের ফিরিস্তি দিয়ে মা আর বাবা তার গুণ-গান করতেন?

৫। একদিন কারনিসে বসে দুই বেড়ালের আলোচনার ফলে কেন অন্য বেড়ালটি কন্‌কে 'বেড়ালতপস্বী' বলে ডাকল?

৬। কন্ বেড়ালকে আঁকো আর তার চেহারার একটা বিবরণ লেখো।

৭। সর্বনাম পদ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো:

(ক) কন্ ফরসা, তবে —— মা-বাবা ফরসা নয়।

(খ) কালো-সাদা বেড়ালটা কন্‌কে বলল, '—— তাহলে বেড়ালতপস্বী!

(গ) রোদ্দুরে বেরুলে মা —— বকে।

(ঘ) কে যেন বলে উঠল, '—— এখানে থাকিস্ নাকি?'

একটানা বর্ষা

বিষ্ণু দে

কয়দিন একটানা বর্ষা
কবে যে আকাশ হবে ফর্সা !
মনে হয় খুব কসে'
আকাশেও গরু পোষে
গলির মোড়ের ভোলা গয়লা,
আকাশে গোয়ালে সে কী ময়লা !

একটানা চলেছেই বর্ষা,
আকাশ না কপালটা ফর্সা।
গরু আর গরু নয়
মোটা আর সরু নয়
বাঁকা সোজা সব বুঝি একাকার।
সূর্য বিনা তো আর টেঁকা ভার ॥

অনুশীলনী

১। একটানা বর্ষা হলে তোমার কেমন লাগে ?

২। মিল দাও :

বর্ষা ——। ময়লা ——। কসে' ——।

৩। বিপরীত শব্দ বসাও :

মোটা ——। সোজা ——। ময়লা ——।

রুপোর ডিম

পি. সি. সরকার



অনেকেই হয়তো জানে না যে, ম্যাজিক দেখানো যত কঠিনই হোক-না কেন তার মূল কৌশল খুবই সহজ। রঙ্গমঞ্চে যে খেলা যত আশ্চর্যজনক —তার ভেতরকার খুঁটিনাটি জানতে পারলে দেখা যাবে সবই বড় রকমের ফাঁকি — নানারকম বুদ্ধির খেলা মাত্র। আসলে ম্যাজিক মাত্রেই হচ্ছে বুদ্ধির বাহাদুরি। আমরা যত খেলা দেখিয়ে থাকি তার পেছনে থাকে যন্ত্রপাতির কৌশল, ঔষধপত্র বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ— আর মাঝে মাঝে তার সঙ্গে থাকে হাত-সাফাইয়ের ব্যাপার। রঙ্গমঞ্চে খেলা দেখাতে হলে বড় বড় যন্ত্রপাতি চাই, সিনসিনারি পোশাক পর্দা আলোকসজ্জা হলে ভালো হয়, কিন্তু চায়ের আসরে বা বন্ধুদের মজলিসে

খেলা দেখাতে হলে যত সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখানো যায় ততই ভালো।

এই সাধারণ ছোট ছোট খেলাগুলিও অনেক সময় বেশ সুনাম পায়। এগুলি যে-কেউ একটু চেষ্টা ক'রেই অনায়াসে ভালোভাবে দেখাতে পারবে।

যেমন, যাদুকর টেবিলের উপর একটা জলভর্তি কাঁচের বাটির মধ্যে একটা রুপোর ডিম এনে হাজির করলেন। ডিমটা রুপোর মতোই ঝকঝক করছে। মনে হবে যেন রুপোলি রং মাখানো ; কিংবা নিকেল-করা ডিম। দর্শকদের কাছে এনে তাঁদের ভেতর থেকে একজনকে ঐ ডিমটি তুলে আনতে বলা হল। আশ্চর্য ! জল থেকে ডিমটি উপরে আনতেই দেখা গেল রুপোর মতো নয় — একেবারে কালো রং সেই ডিমটার ! মনে হয় যেন ওর গায়ে কালো ভুষো কালি মাখিয়ে রাখা হয়েছে।

খেলাটিতে কৌশল কিন্তু খুবই সামান্য — ওতে ভুষোই মাখানো হয়েছিল। মোমবাতির শিখায় ডিমটাকে ধরলে তার রং আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাবে। এই কালো ডিমটি একটা কাঁচের বাটিতে রেখে তাতে কয়েক গেলাস জল ঢেলে দিলে জলের তলায় ঐ ডিম রুপোর মতো ঝকঝক করতে থাকবে। দর্শকদের দেখে মনে হবে জলের মধ্যে সত্যিই বুঝি রুপোর ডিম অথচ জল থেকে তুলে ধরলেই দেখা যাবে ডিমটা মিশমিশে কালো !

এটা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার — মোমবাতির শিখায় যে কালি উঠে আসে সেটি হচ্ছে 'কারবন'—ছোট ছোট কারবন-কণিকা জলে ভেজে না আর ওর চারদিকে পাতলা হাওয়া আটকা পড়ে। ঐ কারবন-কণিকাতে বাইরের আলোকরশ্মি আয়নার মতো প্রতিফলিত হয়ে থাকে—ফলে সমস্তটা ডিম দেখতে মনে হয় যেন রুপোর তৈরি বা নিকেল-করা।

অনুশীলনী

১। ম্যাজিক খেলা দেখে তোমার কী মনে হয় ?

২। ম্যাজিক আসলে কী ?

৩। কালো ডিমকে রুপোলি দেখাতে হলে কী করতে হয় ?

৪। তোমার নিজের মনের মতো একটি ম্যাজিক খেলার বিবরণ দাও।

৫। 'আমি ম্যাজিশিয়ান' — এই শিরোনাম দিয়ে একটি ছবি আঁকো।

৬। বিশেষণ পদ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো :

(ক) ম্যাজিকের —— কৌশল খুবই সহজ।

(খ) —— ম্যাজিকের পেছনে —— ক্রিয়াকলাপ থাকে।

(গ) —— —— ম্যাজিকের খেলাতেও —— সময় —— সুনাম পাওয়া যায়।

(ঘ) —— —— কণিকা জলে ভেজে না, আর ওর —— —— হাওয়া আটকা পড়ে।

শিউলি-ঝরা মাসে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক জোনাকি
দুই জোনাকি
তিন জোনাকি ওড়ে;
তোমার লাগি
বন্ধু, আমার
মন যে কেমন করে!

এক পোহর
দুই পোহর
তিন পোহর রাতি;
তোমার লাগি
বন্ধু, আমার
ঘরে জ্বলছে বাতি।

এক পশলা
দুই পশলা
তিন পশলা ঝরে;
তোমার লাগি
বন্ধু, আমার
পরান কাঁপে ডরে!

অনুশীলনী

১। মুখস্থ বলো।

২। প্রহর, প্রাণ — এই দুটি কথা এই কবিতায় চেহারা বদলে কীভাবে আছে, খুঁজে বার করো।

ইন্তাবিল

শিবানী রায়চৌধুরী



আমার বন্ধু গোপাল। গোপালের ছোট বেলাকার বন্ধু হল ইন্তাবিল। আমি তাকে দেখি নি। কিন্তু তার কথা এত শুনেছি যে মনে মনে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছি। গোপালের লোহার খাটের মশারির চালে ইন্তাবিল বাস করত। সেই সুবাদে গোপালের সঙ্গে তার পরিচয়। ইন্তাবিল লম্বায় ছিল এক ফুট আধ ইঞ্চি। আর তার শরীরটা ছিল শোলার মত হালকা। ডানা ছিল না। কিন্তু হাত দুটো শূন্যে নাড়লেই উড়তে পারত। তার পায়ের তলায় একজোড়া চাকা লাগানো ছিল। তাই সে মাটিতে পা ঘষলেই স্কেটিং ক'রে চলতে পারত। তার মুখে একটা লম্বা মতো স্ট্র লাগানো ছিল। সেই স্ট্র দিয়ে সে শুধু সবুজ

সিরাপ আর কোকো খেত। ইন্তাবিলের গায়ের রংটা ছিল হলুদ আর মুখটা ছিল লাল রঙের। তবে সময়ে সময়ে তার গায়ের রং পালটে যেত। যেমন শীতকালে কুয়াশা-রং হত, বসন্তকালে সোনালী ধরত। এতে ওর রাস্তা দিয়ে চলাফেরার সময় সুবিধা হত। হাওয়ায় মিশে যেতে পারত। এই তো হল ওর চেহারা।

ওর সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা পাখির পালক আর একটা বিরাট টুপি। টুপির গায়ে হি জি বি জি ভাষায় কীসব লেখা ছিল। ইন্তাবিল বলত ওর ঠাকুরদাদার সেজো জ্যেঠামশাই ছিলেন পেঙ্গুইনের বংশধর। তিনি ওই টুপিটা ওকে দিয়ে গেছেন। টুপির গায়ে উত্তরমেরু যাবার রাস্তা বাতলে দেওয়া আছে। বোধহয় ইন্তাবিলের শখ ছিল শেষ বয়সে উত্তরমেরুতে বানপ্রস্থ যাবে!

ইন্তাবিল যে সারাদিন কি করত এ খবর কেউ রাখত না। এমন কি গোপালও না। সে তো আজকালকার ছেলে। ক্রিকেট খেলে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলতি ট্রামে ওঠে। ইন্তাবিলের মত পাগলা লোকের খোঁজ রাখার তার সময় হয় না। আমার সঙ্গে যদিও ইন্তাবিলের আলাপ হয় নি তবুও আমি তার খোঁজখবর করতাম। ইন্তাবিলের পিসতুতো ভাই চট্‌পটি বলত, তার মনে হয় ফড়িয়াপুকুরের মোড়ে ইন্তাবিল জুতো সারাই করে। কিন্তু এ বিষয়ে আমি চট্‌পটির সঙ্গে একমত হতে পারি নি। চট্‌পটি লোক সুবিধের বলে মনে হয় না। নইলে কেউ কি আপন মামার ছেলেকে জুতো সেলাইয়ের মতো কাজে লাগায়! যাই হোক, ঝগড়াঝাঁটি আমি পছন্দ করি নে। সেবার একজনের মুখে শুনেছিলাম ইন্তাবিল প্রজাপতিদের ডানা রং করার কাজ করে। এ কাজটা বেশ ভাল। তবে ইন্তাবিলের মাথায় গোলমাল। সে কী এত কঠিন কাজ পারে!

অনুশীলনী

১। গোপালের বন্ধু ইস্তাবিল মানুষটাকে তোমার কেমন লাগে ?

২। ইস্তাবিল কোথায়ই বা থাকত আর শরীরটাই বা কেমন ছিল ?

৩। ইস্তাবিলের মতো হতে পারলে কেমন হত ?

৪। ইস্তাবিলের ঠাকুরদার সেজো জ্যেঠামশাই কোথাকার লোক ছিলেন ?

৫। ইস্তাবিল জুতো সেলাই করলে, না প্রজাপতির ডানা রঙ করার কাজ করলে তুমি খুশি হও ?

৬। ইস্তাবিলের একটা রঙিন ছবি আঁকো।

৭। বিশেষণের বিশেষণ পদ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো :

(ক) —— অনেক ছেলে চলন্ত বাসে ওঠে।

(খ) —— খাটের মশারির চালে ইস্তাবিল বাস করত।

(গ) পায়ের তলায় —— একজোড়া চাকা লাগানো ছিল।

(ঘ) ইস্তাবিল —— কঠিন কাজ পারত।

চম্পাবরণ কন্যা

বুদ্ধদেব বসু

'রংমশালে'র সম্পাদকের চম্পাবরণ কন্যা
ঘর করেছেন আলো;
সমস্ত তাঁর ভালো
দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।
রাত্তিরে ঘুমোন না;
পূর্ণ চাঁদের তাড়ার মতো,
প্রথম-ফোটা তারার মতো,
সন্ধ্যা হ'লেই তন্দ্রা-হারা চম্পাবরণ কন্যা।
চম্পাবরণ কন্যা;
চোখ দুটি তাঁর কালো,
ঘর করেছেন আলো
দোষের মধ্যে সমস্ত রাত একটুও ঘুমোন না।
একটুও ঘুমোন না;
কাঁদেন এবং কাঁদান তিনি,
হাত-পা ধ'রে সাধান তিনি,
রাত-জাগাদের রাজকুমারী হবেন তিনি কোন্ না।

অনুশীলনী

১। এক কথায় বলো : যার চাঁপার মতো গায়ের রং। যার চোখে ঘুম নেই। যারা সারারাত জেগে থাকে।

২। মুখস্থ বলো।

৩/৭

কানে খুব চোখা

শের জঙ্গ



বাঘকে চোখে কিছুটা কানা বলা গেলেও, বাঘের কান কিন্তু অসম্ভব চোখা। চোখের অভাবটুকু সে কান দিয়ে অনেকখানি পুষিয়ে নেয়।

গভীর জঙ্গলে দিনের বেলাতেও এমনিতেই আলো কম। রাত্তিরে তো কথাই নেই। তার ওপর অনেক জায়গায় চোখ বুঁজে থাকতে হয়; কেন না ডালপালায় আর ছুঁচলো ঘাসে চোখে খোঁচা লেগে যাবে। কুকুরের মতো চোখের বদলে নাকটাকে যে কাজে লাগাবে তার উপায় নেই। জঙ্গলে হাওয়া তেমন বইতেই পারে না। কাজেই গন্ধ পাবে কেমন ক'রে? জঙ্গলে গন্ধ কম পাওয়া যায় ব'লে বাঘের নাক তেমন ধারালো হতে পারেনি।

বাঘের কান দুটো কুলোর মতো না হলেও কিন্তু বেশ বড় বড়। লোমে ঢাকা ব'লে বাইরে থেকে পুরোটা দেখা যায় না। কান খাড়া ক'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে চারিদিকের আওয়াজ ধরে। কিন্তু কুলোর মত কান হওয়ার দুটো অসুবিধে। প্রথমতঃ ঝোপঝাড়ের মধ্যে খোঁচা লাগার ভয়। দ্বিতীয় ভয়টা হল, কানে ঠাণ্ডা লাগার। হিমালয়ের তরাইতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে থাকতে হয়। কাজেই কুলোর মত কান হলে তার চলবে

না। ঠাণ্ডা লাগলে কানের দফা রফা। অথচ কান গেলে বাঘ যে একেবারেই কানা !

বাঘের কানে যে গর্ত, সেটা খুব গভীর নয়। এই গর্তটাকে আটক দিয়েছে হাড়ের একটা দেওয়াল। তার আড়ালে দুটো কক্ষ। এইখানে কানের পর্দার সাহায্যে চলে শোনাশুনির অতি সূক্ষ্ম সব কাজ।

এই আশ্চর্য যন্ত্রটা দিয়ে কম ক'রে দুশো গজ দূর থেকে — গাছ থেকে যদি একটা পাতা খসে, কারো কাপড়ে একটু খস খস শব্দ হয় কিংবা কেউ বইয়ের পাতা ওল্টায় — বাঘ সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলবে।

আওয়াজ যদি খুব জোর হয়, তাহলে কিন্তু বাঘ তা শুনতে পাবে না। কেননা বাঘের কান নিচু পর্দায় বাঁধা। ওর কানের কাছে তুমি যদি গিয়ে খুব জোরে হুইসেল বাজাও, সে আওয়াজ ও কানেই তুলবে না। বাজের কড় কড়, গাছের মড় মড়, গুঁড়িতে গুঁড়িতে ঠেকে কট কট — এসব শব্দ বাঘের কানে যায় না।

কিন্তু কোথায় ধাতুর একটু ঠুং, ক্যামেরার একটু ক্লিক, জুতোর একটু মচ ক'রে আওয়াজ হোক — সঙ্গে সঙ্গে বাঘের কান খাড়া। আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে সে নিখুঁতভাবে তৎক্ষণাৎ ধ'রে ফেলবে।

শুধু হাওয়ায় ভেসে আসা শব্দ নয়, মাটিতে শব্দের যে স্পন্দন হয়— তাও বাঘের কানে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। মাটির কাছে কান রেখে মানুষের বা জন্তুদের চলাফেরার শব্দ সে ঠিক শুনতে পায়।

বনের মধ্যে বাঘ মাথা নিচু ক'রে চলে। তা দেখে যেন ভেবো না বৈষ্ণবদের মতো বাঘের খুব বিনয় কিম্বা বাঘ খুব লাজুক।

আসলে সে চায় মাটির কাছে কান রেখে চলতে।

অনুশীলনী

১। 'কানে খুব চোখা' কথাটা এখানে কেন ব্যবহার করা হয়েছে ?

২। বাঘের নাকের চাইতে কান কেন বেশি সজাগ ?

৩। বাঘের কানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখো।

৪। 'বনের মধ্যে বাঘ মাথা নিচু করে চলে' — কেন ?

৫। সুন্দরবনের বাঘকে পৃথিবীর সব চাইতে ভয়ঙ্কর বাঘ বলা হয় কেন ?

৬। বাক্য রচনা করো :

চোখা, জঙ্গলে, আওয়াজ, সূক্ষ্ম, আশ্চর্য, যন্ত্র, তরাই, হুইসেল, ক্যামেরা, নিখুঁতভাবে।

৭। সুন্দরবনের একটি বাঘ আঁকো। ছবিটির শিরোনাম দাও।

৮। ক্রিয়ার বিশেষণ পদ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো :

(ক) বাঘ কান দিয়ে চোখের অভাব —— পুষিয়ে নেয়।

(খ) —— —— হুইসেল বাজাও।

(গ) সামান্য শব্দ হলেই বাঘ —— —— ধরে ফেলতে পারে।

(ঘ) বাঘ মাথা —— —— চলে।

(ঙ) বাঘ কান —— —— শোনে।

আমাদের অভিধান

(তৃতীয় পাঠমালায় এই শব্দগুলো আছে)

অগ্রগতি — সামনে এগোনো ; উন্নতি।

অচল — চলে না ; অপ্রচলিত।

অদ্ভুত — অবাক করা ; সৃষ্টি ছাড়া ; আজব।

অনবরত — সমানে ; একনাগাড়ে।

অনায়াসে — অক্লেশে ; স্বচ্ছন্দে।

অনুকরণ — নকল।

অনুরাগ — টান ; ভক্তি।

অনুষ্ঠান — উদ্যোগ ; আয়োজন।

অনেক — বহু ; বিস্তর।

অন্তত — কমপক্ষে ; কম ক'রে।

অন্তর্গত — অন্তর্ভুক্ত ; মধ্যে।

অন্দর — বাড়ির মধ্যে।

অন্ধ — দৃষ্টিহীন ; কানা।

অন্ন — ভাত ; আহার্য।

অপমান — অনাদর ; অবজ্ঞা।

অফুরন্ত — যা ফুরায় না ; অশেষ।

অবতীর্ণ — আবির্ভূত ; উপস্থিত।

অবধি — পর্যন্ত ; তক।

অবশ — অসাড়।

অবস্থা — দশা ; হাল।

অভয়ারণ্য — যে বনে পশুপাখিরা নিরাপদে থাকে।

অভিনব — অদ্ভুত ; চমকপ্রদ ; নতুন ধাঁচের।

অভিযান — বিশেষ উদ্দেশ্যে যাওয়া ; বিপদ মাথায় করা।

অভ্যস্ত — রপ্ত ; স্বভাব হয়ে দাঁড়ানো।

অরণ্য — বন ; জঙ্গল।

অর্থহীন — যার মানে নেই ; অনর্থক।

অল্প — কম।

অশোকাভিচ — রুশ নামের অনুকরণে মজা করা।

অসম্ভব — অত্যন্ত ; বেজায় ; যা হয় না।

অসংখ্য — অগণিত ; অগুনতি।

অসুবিধা — বাধা ; মুশকিল।

অস্ত — (সূর্য) ডুবে যাওয়া ; শেষ।

অস্থির — চঞ্চল ; অস্থায়ী।

অহংকেরে — যার দেমাক বেশি।

আঃ — বিরক্তিসূচক ধ্বনি।

আইঢাই — ছটফট ; হাঁসফাঁস।

আকর্ষণ — টান।

আকার — গড়ন ; গঠন ; চেহারা।

আগন্তুক — নবাগত ; অতিথি।

আগা — ডগা ; অগ্রভাগ।

আগাছা — বাজে গাছপালা।

আগে — প্রথমে ; গোড়ায় ; পূর্বে ; সামনে।

আগ্রহাতিশয্যে — বেশি রকমের আগ্রহের ফলে।

আঘাত করা — ঘা দেওয়া।
আঁচড় — দাগ ; নখাঘাত।
আচারবিধি — ধরাবাঁধা অনুষ্ঠান।
আজকালকার — একালের ; আধুনিক।
আটক — বন্দী ; অবরুদ্ধ।
আঢাকা — খোলা ; ঢাকা নয়।
আঁতুড়ঘর — শিশু জন্মানোর ঘর।
আদর — যত্ন ; খাতির।
আদিখ্যেতা — বেশি আদর দেখানো ; আধিক্য ; বাড়াবাড়ি।
আদ্যিকাল — গোড়ার যুগ ; আদিমকাল।
আদৌ — একেবারেই ; মোটেই।
আপদ — মুশকিল ; বালাই।
আবাদ — চাষ ; কৃষি।
আবিষ্কার — অজানাকে জানা।
আমল — রাজত্বকাল ; সময়।
আয়া — যে বাচ্চার দেখাশুনো করে ; শিশুদের পরিচারিকা।
আরম্ভ — শুরু।
আল্‌সে — (১) কুঁড়ে, অলস ; (২) ছাদের কারনিস (আলিসা)।
আলাদা — অন্য ; ভিন্ন।
আলাপ — ভাব ; কথাবার্তা।
আলোকরশ্মি — আলোর কিরণ।
আলোকসজ্জা — আলোক দিয়ে সাজানো।
আশ্চর্য — অদ্ভুত ; অবাক।
আশ্চর্যজনক — অবাক-করা।
আশ্রয় — ঠাঁই ; শরণ।
আসন — বসবার জায়গা।
আসর — সভা ; মজলিস।
আস্কেপিঠে — চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি পিঠে।
আহার — খাবার ; খোরাক।
আহারাদি — খাওয়া-দাওয়া।

ইৎরমি — নীচতা ; নোংরামি।
ইত্না — 'এত'-র হিন্দি।
ইয়ারবক্সি — ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
ইশারা — ইঙ্গিত ; সংকেত।
ইস্তফা — পদত্যাগ ; ছাড়া ; ছেড়ে দেওয়া।

উই — পিঁপড়ের মতো একরকমের সাদা পোকা।
উচ্চস্বরে — উঁচু গলায় ; চেঁচিয়ে।
উচ্চারণ — মুখ ফুটে বলা ; কথন।
উজান — স্রোতের বিপরীত।
উড়ু উড়ু — উড়ে যাবে ; অস্থির।
উড়ুক্কু — যে উড়তে পারে।
উত্তরমেরু — পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত ; সুমেরু।
উত্তেজনা — টগবগ করা ; টান-টান ; ফেটে পড়ার ভাব।
উৎপাত — উপদ্রব ; দৌরাত্ম্য।
উৎসব — আনন্দময় অনুষ্ঠান।
উদ্দেশ — সন্ধান ; লক্ষ্য।
উদ্দেশ্য — মতলব ; অভিপ্রায়।

উদ্ধার — মুক্তি ; পরিত্রাণ ; ছাড়ান।
উনুন — চুলা ; আখা।
উপদ্রব — উৎপাত।
উপস্থিত — হাজির ; বর্তমান।
উপায় — (১) কৌশল ; পন্থা ; পথ ;
(২) আয় ; রোজগার।

একলা — একা।
এক শামুক নস্যি — শামুকের খোলে রাখা নস্যি।
একাকার — একসা ; মিলেমিশে এক হওয়া।
এহেন — এমন ; এমন যে সেই।

ওজন করা — দাঁড়িপাল্লায় মাপা।
ওস্তাদি — নিপুণতা ; কারদানি।

ঋতু — বছরের ছ'টি ভাগ বা পালা।

কক্ষ—ঘর ; কোল।
কচি — অতি শিশু ; যা পাকা নয়।
কঠিন — শক্ত।
কড়া — কঠিন ; কড়াই ; আংটা।
কণিকা — কণা ; চালের খুদ।
কণ্ঠমালা — গলার মালা।
কদর — মান ; মর্যাদা ; মূল্য।
কন্যা — মেয়ে ; কনে।
কবিরাজ — বৈদ্য ; আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক।
কর্ম — কাজ
কলপ — পাকা চুল কালো করার রঙ।
কলরব — চেঁচামেচি ; কিচিরমিচির।
কলু — তৈলকার ; যে তেল বানায়।
কসে' — এঁটে ; শক্ত ক'রে।
কষ্ট — দুঃখ ; ক্লেশ।
কাণ্ড—গাছের গুঁড়ি ; ব্যাপার ; পর্ব।
কাত — পাশ ; আড়।
কানা — এক চক্ষুহীন।
কাবু — জব্দ ; দুর্বল ; কাহিল।
কামনা — বাসনা ; ইচ্ছা।
কারদানি — কৃতিত্ব ; কেরামতি।
কারনিস — ছাদের প্রান্ত ; আল্‌সে।
কারবন — অঙ্গার ; কয়লা, হীরে ও সীসের মূল পদার্থ।
কারা — বন্দীশালা ; জেলখানা।
কাল — সময় ; যম ; সর্বনাশের কারণ।
কালাপানি — যে সমুদ্রের জল কালো, ভারত মহাসাগর।
কিবা — কি আর ; কি।
কুচকাওয়াজ — প্যারেড ; সৈনিকদের সমবেত ব্যায়ামশিক্ষা।
কুয়াশা — কুজ্ঝটিকা ; কুহেলি।
কুলো — ধান ইত্যাদি ঝাড়বার ডালা।
কৃত্রিম — প্রকৃতিজাত নয় ; নকল।
কেস — আধার ; খোল ; মামলা ; ব্যাপার।
কেয়ার — তোয়াক্কা ; ভয়।
কোকো — ভাজা কাকাও দানার গুঁড়ো, যা দিয়ে চকোলেট তৈরি হয়।

কোঁচড় — কোঁচার কাপড় ; কোল।
কোলাহল — গোলমাল ; হল্লা।
কোস্‌নে — বলিস নে।
কৌশল — কায়দা ; দক্ষতা।
ক্রন্দন — কান্না ; রোদন।
ক্রস — ক্রুশচিহ্ন ; ঢ্যাঁরা।
ক্রিয়াকলাপ — কাজকর্ম ; অনুষ্ঠানসমূহ।
ক্লিক — ক্যামেরায় শাটার টেপার খুট্‌ শব্দ।
ক্ষণ — মুহূর্ত।
ক্ষমতা — শক্তি ; বল।
ক্ষুদে — ছোট্ট।
ক্ষুদ্র — ছোট।
ক্ষেত — ক্ষেত্র ; আবাদ।
খাঁড়া — খড়্গ।
খাদ্য — খাবার ; খাওয়ার মতো।
খুচরো — ছোটখাটো ; টাকার ভাঙানি।
খুঁটিনাটি — সবিশেষ ; বিশদ ; বিস্তারিত ; তুচ্ছ।
খৃস্টপূর্ব — খৃস্টের জন্মের আগে।
খেয়াল — শখ ; ইচ্ছা ; হুঁশ।
খাঁদা — যার নাক চাপা।
গজ — দৈর্ঘ্যের মাপ বিশেষ ; হাতি।
গনৎকার — দৈবজ্ঞ ; যে গণনা করে।
গতি — যাওয়া ; চলন ; পরিণাম ; উপায়।
গঁদ — একরকম গাছের আঠা।
গভীর — নিবিড় ; গহন ; গাঢ় ; অগাধ।
গম্ভীর — ধীর ; অচপল ; ভারী।
গয়লা — গোয়ালা ; গোপালক।
গরজন — গর্জন ; নাদ।
গরজি — হুঙ্কার ক'রে ; গর্জন ক'রে।
গরব — গর্ব ; অহঙ্কার ; দেমাক।
গরল — বিষ।
গর্জন — ভীষণ হাঁক ; হুঙ্কার।
গাছগাছালি — গাছ গুল্মলতা।
গাল দেওয়া — কটুবাক্য বলা।
গুচ্ছের — একগাদা ; কতকগুলো।
গুঞ্জন — গুন্‌ গুন্‌ শব্দ ; ঝঙ্কার।
গুটিসুটি — শরীর গুটিয়ে থাকা।
গুমর — গর্ব ; দেমাক।
গুমোট — বায়ু চলাচলের অভাবে গরম।
গুরুতর — ভারী ; সাজ্ঘাতিক।
গোড়া — মূল ; শিকড়।
গোড়াকার — গোড়ার ; আরম্ভের।
গোধন — গো-সম্পদ।
গোঁয়ার — একরোখা ; রগচটা।
গোয়াল — গোশালা ; গরু থাকার জায়গা।
গোয়ালা — গোপালক।
গোলমাল — হৈ চৈ ; হল্লা।
গোলা — মরাই ; ধান রাখার জায়গা।
গ্রাহ্য — গ্রহণযোগ্য ; স্বীকার্য ; মান্য।
গ্রীষ্মকাল — গরমকাল ; নিদাঘ।

ঘট হয়ে — ঘটের মতো ঠায় বসে।
ঘটি — একরকম পাত্র।
ঘানিগাছ — তেল বের করার জন্যে গাছের গুঁড়ির তৈরি যে-খোলে বীজ ঢালা হয়।
ঘোর — (বিণ.) গভীর, গাঢ় ; (বি.) আচ্ছন্নতা, ঝিম।
ঘোরতর — ভীষণ ; গহন।

চকিতে — পলকে ; সহসা।
চণ্ডাল — নিষ্ঠুর লোক।
চমৎকার — অতি সুন্দর।
চম্পাবরণ — চাঁপাফুলের মতো রঙ।
চর — গুপ্তচর ; দূত ; চড়া।
চাদর — ঢাকা ; আলোয়ান।
চাঁদোয়া — শামিয়ানা।
চাল — ছাদ ; আচ্ছাদন ; রীতি।
চিকন — কাপড়ের ওপর ছুঁচের কাজ ; সুতো, রেশম বা জরির নকশা ; চকচকে।
চিত্রগ্রীব — পায়রা, যার গলায় ছিটছিট দাগ।
চিন্তা — ধারণা ; ভাবনা।
চিরকাল — বরাবর ; চিরদিন।
চুনকালি — চুন আর কালি।
চুরুট — সিগার।
চুলো — উনুন।
চুল্লী — চুলা।
চেঞ্জ — হাওয়া-বদল ; স্বাস্থ্যোদ্ধার।
চেলী — পট্টবস্ত্র ; বিবাহাদিতে পরবার রেশমী কাপড়।
চেহারা — মূর্তি ; রূপ।
চোখা — তীক্ষ্ণ ; ধারালো।
চৌকো — চারকোনা।
চৌচির — চার খণ্ড ; টুকরো টুকরো।
চৌতলা — চারতলা।

ছড়া — একরকমের মিল দেওয়া পদ্য ; গুচ্ছ ; মালা।
ছত্রধর — যে ছাতা ধরে থাকে।
ছাতি — ছাতা ; বুক।
ছিট — নক্‌শাদার ছাপা কাপড়।
ছুঁচলো — তীক্ষ্ণ ; সরু।
ছেলেধরা — যে ছেলে চুরি করে।
ছোপ — দাগ।
ছোঃ — ধিক্কার ; বিদ্রূপসূচক শব্দ।

জগৎ — বিশ্ব ; ভুবন।
জগৎদুর্লভ — জগতে এমনটি আর মেলে না।
জননী — মা ; জন্মদায়িনী।
জব্বর, জবর — জোরালো ; দুর্দান্ত।
জমকালো — বাহারে ; জাঁকাল।
জরি — সোনালি বা রুপোলি তার বা সুতো।
জল কাটা — জলের ভেতর দিয়ে যাওয়া।
জলছবি — যে ছবি জলে ভিজিয়ে অন্য জায়গায় ছাপ তোলা যায়।

জলধারা — জলের প্রবাহ।
জলপান — (১) জল খাওয়া, তৃষ্ণা নিবারণ; (২) জলখাবার।
জলা — যে জমিতে জল জমে থাকে।
জল্পনা — কথার জাল বোনা; পরামর্শ।
জাঁতাকল — শস্যাদি পেষাই যন্ত্র।
জাতি — প্রকার; বর্গ; একদেশীয়।
জানোয়ার — জন্তু; প্রাণী।
জাল — দড়ি বা সুতো দিয়ে বোনা ফাঁদ; মেকি।
জিজ্ঞাসা — জানবার ইচ্ছা; প্রশ্ন।
জিরো — শূন্য।
জেঠু — জ্যাঠামশাই।
জেলা — কয়েকটি মহকুমা নিয়ে যে-অঞ্চল; প্রদেশ-বিভাগ।
জোগাড় — সংগ্রহ।
জোট — দল; সমাবেশ; মিলন।
জোড়া — যুক্ত; একত্রে দুটি।
জোয়ান — যুবক; বলিষ্ঠ।
জোর — (বিণ.) জবর; বড়; মস্ত; (বি.) শক্তি; ক্ষমতা।
জালাতন পোড়াতন — বিরক্ত; উত্ত্যক্ত।

ঝরনা — ফোয়ারা; নির্ঝর।
ঝাঁকড়া — লম্বা গোছা গোছা।
ঝাপটা — ঝড় বা বাতাসের ধাক্কা; বৃষ্টির ছাট।
ঝামটা — ধমক।
ঝামেলা — মুশকিল; ঝঞ্ঝাট।
ঝালর — মশারি বা চাঁদোয়ার তলাকার ঝোলানো অংশ।
ঝুঁটি — চুড়োবাঁধা চুল; চুড়োর মত অংশ।
ঝুলি — থলি।
ঝোঁক — ঝুঁকে থাকার ভাব; টান।
ঝোড়ো — ঝড়যুক্ত; ঝড়ের মতো।

টঙ্কার — ধনুকের ছিলা টেনে ছেড়ে দেবার শব্দ।
টাক — মাথার চুল উঠে যাওয়া; চুলহীন মাথা।
টিপ — কপালের ফোঁটা; তাক; লক্ষ্য; বুড়ো আঙুলের ডগা।
টুপি — মাথার আবরণ।
টেঁকা — থাকা; বজায় থাকা; বাঁচা।
টোল পড়া — ছোট গর্ত হওয়া; তোবড়ানো।

ঠাট্টা-তামাশা — রঙ্গ পরিহাস।
ঠান্‌দি — ঠাকরুন; ঠাকুরমা।
ঠ্যাকারে — অহংকেরে।

ডর — ভয়।
ডাইভ — জলে ঝাঁপ দেওয়া; বুক চিতিয়ে পড়া।
ডানা — পাখনা।
ডিগবাজি — ওল্‌টানো।

ডোবা — ছোট পুকুর ; গর্ত।
ডোরাকাটা — রেখাযুক্ত ; বাঘ।
ডেঁপো — ফাজিল ; এঁচড়ে পাকা।

ঢং — ভঙ্গি।
ঢাল — যা দিয়ে তরোয়ালের আঘাত ঠেকানো হয়।
ঢুল — তন্দ্রা ; ঝিমুনি।

তৎক্ষণাৎ — তক্ষুণি ; সেই মুহূর্তে।
তন্দ্রা — ঢুলুনি ; ঝিমুনি।
তরাই — পাহাড়তলী।
তাগিদ — তাড়া ; তাগাদা ; প্রয়োজন।
তামাটে — তামার মতো রঙযুক্ত।
তালঠোকা — আস্ফালন করা।
তালবেতাল সিদ্ধ — ভূতপ্রেত যার বশীভূত।
তায় — তার ওপর ; তাতে।
তীরবর্তী — উপকূলস্থ ; পাড়ের।
তীর্থ — পুণ্যস্থান।
তুখোড় — চতুর ; দক্ষ।
তুচ্ছ — নগণ্য ; অসার ; হেয়।
তোয়াক্কা — ভয় ; সমীহ।
ত্বক — চামড়া।
তেজিব — ত্যাগ করব ; ছাড়ব।
ত্যাজিয়া — ত্যাগ ক'রে ; ছেড়ে।
ত্রিলোক — স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল।

থুয়ে — রেখে।

দণ্ডধর — যার হাতে দণ্ড ; শাসক।
দর্জি — যে জামাকাপড় সেলাই করে।
দস্যি — দুরন্ত।
দাঁড় — বৈঠা ; লগি।
দাওয়া — বারান্দা ; রোয়াক।
দালান — পাকা বাড়ি।
দাস — চাকর ; ভৃত্য।
দাসী — ঝি ; পরিচারিকা।
দিশাহারা — দিগভ্রান্ত ; নিরুপায়।
দীঘি — বড় পুকুর ; সায়র।
দীর্ঘজীবী — দীর্ঘায়ু।
দীন — দরিদ্র।
দুঃখহারী — যে দুঃখ দূর করে।
দুদমা — দু'বার ফাটে যে-বোমা।
দুয়ারী — দ্বাররক্ষী।
দুয়ো — ধিক্কার দেওয়া।
দুর্দশা — দুরবস্থা ; দুর্গতি।
দুর্বল — শক্তিহীন ; গায়ের জোর কম।
দুল — কানের গহনা।
দুষ্টু — শয়তান ; পাজী ; দুরন্ত ; বদমাশ।
দূর — তফাত।
দূরান্ত — আরও দূর।
দৃশ্য — যা দেখা যাচ্ছে।
দৃষ্টি — নজর।
দৈবাৎ — হঠাৎ।
দোলা — দোলনা।
দোঁহা — দুজন ; দু'চরণ বিশিষ্ট কবিতার পদ।

দৌড় — ছুট ; ক্ষমতা ; সীমা।
দ্বন্দ্ব — ঝগড়া ; বিবাদ।
দ্বিতীয়ার চাঁদ — শীর্ণ চাঁদ।

ধন — (১) আদরের বাছা ; (২) অর্থ ; সম্পদ ; দৌলত।
ধন্ধ — সংশয় ; ধাঁধা।
ধর্ম — (১) ভিন্ন ভিন্ন মতের উপাসনা পদ্ধতি ; শাস্ত্রীয় বিশ্বাস ; (২) গুণ ; স্বভাব।
ধাতুপিণ্ড — ধাতুর তাল।
ধাতুমুদ্রা — ধাতুর তৈরি টাকাকড়ি।
ধানভানা — ঢেঁকিতে ধান কোটা।
ধারা — প্রবাহ।
ধীরে — আস্তে।
ধুধু — ফাঁকা।
ধূসর — ছাই রঙ ; পাংশু।

নক্‌শা — রেখাচিত্র।
নগণ্য — তুচ্ছ ; সামান্য।
নগরপাল — কোটাল নগররক্ষক ; পুলিশপ্রধান।
নবৎখানা — যে মঞ্চে সানাই ইত্যাদি বাজানো হয়।
নবমী পুজো — বিজয়ার আগের দিন।
নবাবি — বড়লোকি ; বিলাসিতা।
নামজাদা — বিখ্যাত।
নাস্তানাবুদ — নাজেহাল ; নাকাল ; পর্যুদস্ত।
নিকেল করা — নিকেল ধাতুর চকচকে প্রলেপ দেওয়া।
নিখিল — সমস্ত ; সর্ব।
নিখুঁত — দোষত্রুটিহীন।
নিগড় — শিকল ; বেড়ি।
নিজস্ব — নিজের।
নিতান্ত — একেবারেই ; অতিশয়।
নিত্য — সর্বদা ; সতত ; সবসময়।
নিদ্রিত — ঘুমন্ত।
নিভন্ত — নিভু-নিভু ; নিভে-আসা।
নিমন্ত্রণ — সাদরে ডাকা।
নিরাপদে — নির্বিঘ্নে।
নির্জন — নিরিবিলি ; জনমানবশূন্য।
নির্দিষ্ট — প্রদর্শিত ; স্থিরীকৃত।
নির্বোধ — বোকা ; মূর্খ।
নির্মাণ-শৈলী — গড়বার রীতি ; রচনাপ্রণালী।
নিস্তব্ধ — নিস্পন্দ ; চুপচাপ ; নীরব ; নিশুতি।
নুড়ি — পাথরের ছোট টুকরো।
নেড়ী — যে মেয়ের মাথা নেড়া।
নেশা — আসক্তি ; মোহ।
নোটন — লুটিয়ে-পড়া নাচের ভঙ্গিযুক্ত ; যে-পায়রাদের ওড়ানো হয়।

প'ল — পড়ল।
পক্ষিরাজ — ডানাওয়ালা কাল্পনিক ঘোড়া।
পছন্দ — বাছাই ; মনের মতো।

পণ্ডিত — বিদ্বান ; জ্ঞানী।
পণ্য — কেনাবেচার জিনিস।
পত্তন — প্রতিষ্ঠা ; প্রবর্তন।
পথ — সড়ক ; রাস্তা।
পথঘাট — যাতায়াত ব্যবস্থা।
পথ্য — রোগীর খাবার।
পরব — উৎসব।
পরম — যার পর নাই।
পরস্পরের — একে অপরের।
পরান — প্রাণ।
পরামর্শ — উপদেশ ; মন্ত্রণা।
পরিচয় — জানাশোনা ; নিদর্শন।
পরিমাণ — মাপ।
পর্দা — ঢাকা।
পর্ব — উৎসব ; গ্রন্থি ; অধ্যায়।
পর্বত — পাহাড়।
পর্যন্ত — অবধি।
পলক — নিমেষ।
পল্টন — সৈন্যদল ; ফৌজ।
পশলা — একবারের বর্ষণ।
পাছে — পিছনে।
পাটাতন — কাঠের মেঝে।
পাতাল — ভূগর্ভ ; মাটির নিচে।
পাঁতি — পঙক্তি ; সারি।
পান — খাওয়া।
পাঁশুটে — ছাই-রঙা ; ফ্যাকাসে।
পার্বণ — পরব।
পালঙ্ক — নক্‌শা-করা বাহারী খাট।
পালাবদল — ঋতুবদল ; পর্ব বদল হওয়া।
পাশ্চাত্য — পশ্চিমের জগৎ ; প্রতীচ্য।
পাস — সফল।
পিপীলিকা — পিঁপড়ে।
পিল্‌পে — জমির সীমানা-বোঝানো থাম।
পীর — মুসলমান সাধু।
পুরস্কার — বখ্‌শিশ ; ইনাম ; পারিতোষিক।
পূর্ণ — ষোলকলা ; ভরা ; পুরো ; সিদ্ধ ; সাঙ্গ।
পৃথিবী — দুনিয়া ; জগৎ।
পেঙ্গুইন — দক্ষিণ গোলার্ধের বাসিন্দা এক ধরনের জলের পাখি।
পেয়ারের — আদরের।
পেষণ — বাটা ; মর্দন ; চাপা।
পোহর — প্রহর।
প্রকট — স্পষ্ট।
প্রকাণ্ড — মস্ত ; বিশাল।
প্রকৃতি — বৃক্ষ-পর্বতাদি জড়জগৎ ; ভাব-স্বভাব।
প্রচণ্ড — অত্যন্ত ; প্রবল ; দারুণ।
প্রচুর — অনেক ; বিস্তর।
প্রতাপ — পরাক্রম ; তেজ ; প্রভাব।
প্রতিকার — প্রতিবিধান ; বিহিত।
প্রতিফলিত — আলো ফিরে আসা।
প্রতিশব্দ — সমার্থক শব্দ।
প্রথা — রীতি ; প্রচলিত আচার ; নিয়ম ; পদ্ধতি।
প্রবীণ — বৃদ্ধ ; অভিজ্ঞ ; বহুদর্শী।
প্রবেশ — ঢোকা।

প্রমত্ত — বেহুঁশ ; নেশাগ্রস্ত ; যার মাথার ঠিক নেই।
প্রস্থান — বেরিয়ে যাওয়া।
প্রহর — দিনরাত্রির আটভাগের একভাগ ; তিন ঘণ্টা।
প্রাচীন — সেকালের ; সাবেক কালের।
প্রাণ — জীবন ; জান।
প্রাণধারণ — বেঁচে থাকা ; টিঁকে থাকা।
প্রান্ত — কিনারা ; ধার।

ফন্দি — কৌশল ; মতলব।
ফাঁপর — মুশকিল ; কী করবে ভেবে না পাওয়া।
ফুড়ুৎ — পাখি উড়ে যাওয়ার শব্দ।
ফুর্তি — আনন্দ ; মজা।
ফেল — বিফল।
ফোকলা — দন্তহীন।
ফান্সি — মনোহারী ; বাহারী।
ফ্রেম — বন্ধনী।

বই — (১) ছাড়া; (২) গ্রন্থ; কেতাব।
বংশ — কুল ; বাঁশ।
বংশধর — সন্তান ; কুলের ধারা যে বজায় রাখে।
বখ্‌শিশ — পুরস্কার ; খুশি হয়ে যা দেওয়া হয়।
বগলদাবা — বগলে পোরা।
বচন — কথা ; ভক্তি।
বজ্জাত — দুষ্টু ; বদ্‌মাশ।
বড়াই — অহঙ্কার ; দেমাক।
বদন — মুখ।
বদ্ধ — বাঁধা ; বন্দী।
বধ — হত্যা ; সংহার।
বধিল — বধ করল ; মেরে ফেলল।
বনসম্পদ — বনজাত জিনিস ; বন থেকে পাওয়া সম্পদ
বনিবনা — সদ্ভাব ; মনের মিল।
বনেদী — অভিজাত ; প্রতিষ্ঠিত।
বন্দী — আটক।
বন্ধুত্ব — মিতালী।
বপু — শরীর।
বয়ে গেছে — নষ্ট হয়ে গেছে ; দরকার নেই ; ক্ষতি নেই।
বরাবর — (১) দিকে ; কাছে ; (২) চিরদিন ; সব সময়।
বর্গী — লুণ্ঠনকারী ; প্রাচীন আমলের মারাঠি ঘোড়সওয়ার দস্যু।
বর্জন — ত্যাগ ; ছাড়া।
বর্ণ — রঙ ; জাতিভেদ প্রথা।
বল — শক্তি ; খেলার ভাঁটা।
বসতি—লোকালয়; লোকজনের বাস।
বস্ত্র — কাপড়।
বহুরূপী — যে নানা মূর্তিতে সাজে ; কাঁকলাস জাতীয় জীব।
বা — (১) বাতাস ; (২) অথবা।
বাক্যবীর — যে মুখে খুব বাহাদুরি দেখায়।

বাছা — সন্তান।
বাণ — তীর ; শর।
বাতলে — ব'লে ; বুঝিয়ে।
বাদা — জলাভূমি ; জঙ্গলময় অঞ্চল।
বানপ্রস্থ — বয়স হলে বনে গিয়ে থাকা।
বানিয়ে — তৈরি ক'রে।
বাপ — বাবা ; বাছা।
বাবুয়ানা — বাবুগিরি ; বিলাসিতা।
বামুন — ব্রাহ্মণ।
বায়না — আবদার।
বায়নাকুলার — যাতে চোখ লাগিয়ে দূরের জিনিস দেখা যায়।
বালক — কমবয়সী ছেলে।
বাস্তব — প্রকৃত ; যথার্থ ; জগতে যা আছে।
বাহাদুরি — বীরত্ব ; নৈপুণ্য।
বিকট — উৎকট।
বিনয় — নম্রতা।
বিনিময় — দেওয়া-নেওয়া ; বদল।
বিন্দু — ফোঁটা।
বিরাট — প্রকাণ্ড ; বিশাল।
বিল — বড় দীঘি ; সায়র।
বিলীন — বিলুপ্ত ; একাকার।
বিল্লি — বেড়াল।
বিশাল — প্রকাণ্ড ; বিরাট।
বিশেষ — তফাত ; তারতম্য।
বিশ্বস্ত — বিশ্বাসভাজন ; যাকে ভরসা করা যায়।
বিষম — বেজায় ; দারুণ।
বিষয় — (১) ব্যাপার ; (২) সম্পত্তি।
বিস্ময় — চমক ; অবাক হওয়া ; আশ্চর্য।
বীণ — এক রকমের তারের বাজনা।
বীর — বাহাদুর ; পালোয়ান ; রথী-মহারথী।
বুটি — ছুঁচ দিয়ে কাপড়ে তোলা ফুল।
বৃহৎ — বড়।
বেড়াজাল — ঘেরা ফাঁদ।
বেড়ালতপস্বী — ভণ্ড।
বেদেনী — যাযাবরী।
বৈজ্ঞানিক — (বিণ.) বিজ্ঞানসম্মত ; (বি.) যিনি বিজ্ঞান চর্চা করেন।
বৈঠকখানা — বসবার ঘর।
বৈষ্ণব — বিষ্ণুভক্ত।
বোমার যুগ — যে সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বোমা তৈরি করতেন।
ব্যথা — বেদনা ; কষ্ট।
ব্যবস্থা — বন্দোবস্ত ; জোগাড়।
ব্যস্ত — ব্যগ্র ; অস্থির।
ব্যাখ্যা — বোঝানো।
ব্যাধ — শিকারী জাতি বিশেষ।
ব্যাপার — বিষয় ; ঘটনা।
ব্রহ্মময় — ঈশ্বরময়।
ব্রাশ — বুরুশ।

ভক্তি — টান ; ভরসা ; শ্রদ্ধা।
ভখিব — ভক্ষণ করিব ; খাব।
ভয়ঙ্কর — ভীষণ ; দারুণ।

ভাটা, ভাটি — যখন নদীর জল নেমে যায়।
ভাঁটা — গোলাকার খেলার জিনিস ; বল।
ভাঁড়ার — খাবারদাবার রাখবার জায়গা।
ভিটে — বাস্তু ; থাকবার বাড়ি।
ভুষো — আগুনের শিষ থেকে পাওয়া কালি।
ভূ-ভারতে — সারা দুনিয়াতে।
ভূমি — স্থল ; জায়গা।
ভেক — ব্যাঙ।
ভেদ — পার্থক্য ; তফাত।
ভেনেছি — ধান ঢেঁকিতে ছেঁটেছি।
ভেলকি — যাদু।
ভোটকম্বল — ভুটান বা তিব্বতদেশের কম্বল।

মখমল — ভেলভেট ; নরম চকচকে পুরু কাপড়।
মজবুত — শক্ত ; টেঁকসই।
মজলিস — আসর।
মজুর — শ্রমিক ; যে গতরে খাটে।
মঠ — সাধুসন্তদের আশ্রম বা আখড়া।
মধ্যে — ভেতরে।
মনমরা — বিষণ্ণ ; বিমর্ষ।
মনু — মানুষের কল্পিত আদিপুরুষ।
মন্দ — (১) দুর্বল ; মৃদু ; (২) খারাপ।
মরি-বাঁচি — প্রাণপণ।
মস্ত — বিরাট ; বড়।
মহল — ভবন ; গৃহ।
মহাগ্রীব — যার ঘাড় বা গলা বড়।
মহাজনী নৌকো — ব্যবসাদারদের মাল-বওয়ার নৌকো।
মহাতেজস্বী — অতিশয় তেজসম্পন্ন।
মহাদেশ — বহু দেশ জোড়া বিরাট ভূভাগ।
মহাধার্মিক — মহাধর্মপরায়ণ।
মহাপুরুষ — মহামানব।
মহাবুদ্ধ — মহাজ্ঞানী।
মহামানবধর্ম — মানুষের সেবার মহান্ ধর্ম।
মাইল — এখনকার ১.৬০৯৩ কিলোমিটার (দেড় কিলো-মিটারের কিছু বেশি)।
মাতিয়ে — বিভোর ক'রে ; মোহিত ক'রে।
মাতৃভক্ত — মায়ের অনুগত।
মাত্র — কেবল ; শুধু।
মাথা কাটা যাওয়া — খুব লজ্জা পাওয়া।
মাধ্যম — মধ্যবর্তী ; সহায় ; বাহন।
মাপকাঠি — মানদণ্ড।
মারণী — যা দিয়ে মারা হয়।
মারমেড — মৎস্যকন্যা।
মালাই — মালয়দেশীয়।
মিলেমিশে — বনিবনা ক'রে ; অভিন্ন হ'য়ে।
মিশমিশে — মিশির মতো কালো।
মুকুট — রাজারানীরা মাথায় পরে।

মুদ্রা — টাকাপয়সা ; সীলমোহর।
মুদ্রাঙ্কন — ছাপ দেওয়া ; টাকা ছাপানো।
মূর্খ — অজ্ঞ ; বোকা।
মূল — শিকড় ; গোড়া।
মূল্য — দাম ; দর।
মৃত্যু —মরণ ; মরে যাওয়া।
মেওয়া — ফল ; বাদাম পেস্তা আখরোট।
মেরু — পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত।
মোদের — আমাদের।
ম্যাজিক — যাদু।
ম্লান — মলিন ; নিরানন্দ।

যবে — যখন, যেদিন।
যম — মৃত্যু ; শমন ; ধর্মরাজ।
যোজন — পুরাণে দূরত্বের মাপ (চার ক্রোশে এক যোজন)।

রক্তখাকী — রক্তপায়ী।
রক্তচন্দন — লাল চন্দন।
রক্ষা — বাঁচানো ; রাখা।
রঙ্গমঞ্চ — যে মঞ্চে অভিনয় হয় ; স্টেজ।
রটিয়ে — প্রচার ক'রে ; রটনা ক'রে।
রব — আওয়াজ ; ধ্বনি।
রবি — সূর্য।
রয় — থাকে।
রসনা — জিভ।
রাক্ষস — পুরাণে কল্পিত নরখাদকের জাত।
রাগে — ভালোবাসা, টান।
রাজত্ব — রাজ্য।
রাজচক্রবর্তী — অবাধ ক্ষমতার নৃপতি ; সম্রাট।
রাজাধিরাজ — রাজার রাজা ; সম্রাট।
রীতিনীতি — নিয়মকানুন।
রুইতে — রোপণ করতে ; চারা লাগাতে।
রুষি — রেগে ; রুষ্ট হয়ে।
রূপ — শোভা ; সৌন্দর্য।
রূপবান — সুন্দর।
রেওয়াজ — প্রথা ; অভ্যাস।
রোজকার — প্রতিদিনের।
রোজগার — আয় ; উপার্জন।

লক্ষণ — চিহ্ন।
লক্ষ্মী — দেবী ; শান্ত ; সুবোধ।
লম্ফঝম্প — লাফঝাঁপ।
লাঙল — হাল।
লামা — তিব্বতী বৌদ্ধ পুরোহিত।
লালিত — প্রতিপালিত।
লিপি — চিঠি ; হরফ।
লোকালয় — বসতি।
লোটে — গড়াগড়ি যায়।
লোনা — নোনা ; লবণাক্ত।
লোপ — বিনাশ ; হারানো।

লোভী — লোলুপ।
ল্যাংচানো — খুঁড়িয়ে চলা।

শক্তি — ক্ষমতা।
শতক — শতাব্দী।
শত্রু — বিপক্ষ ; অনিষ্টকারী।
শব্দ — আওয়াজ।
শরীর — দেহ।
শশী — চাঁদ।
শস্য — ফসল।
শাক্যবংশ — এক বিশেষ ক্ষত্রিয় বংশ।
শান্ত — ধীর ; চুপচাপ।
শালপ্রাংশু — শালগাছের মতো লম্বা।
শাস্ত্র — ধর্মগ্রন্থ ; পুঁথি ; তত্ত্ব।
শিখা — শিষ ; চূড়া।
শিরোহীন — মুণ্ডুহীন।
শিশু — বাচ্চা।
শুকসারী — টিয়া বা তোতা স্ত্রীপুরুষ।
শুরু — আরম্ভ ; সূচনা।
শূদ্র — মানুষের সর্বনিম্ন বর্ণ সম্প্রদায়।
শৃগাল — শিয়াল।
শ্রম — খাটুনি ; মেহনত।
শ্বেত — সাদা।

ষাট ষাট — সন্তানাদির যাতে অকল্যাণ না হয় তার জন্য মা ষষ্ঠী দেবীকে ডাকা।

সং — নানা সাজে সেজে লোককে যে মজা দেয়।
সংকীর্ণ — সরু ; উদার নয়।
সংবাদদাতা — কাগজে খবর যে জোগায়।
সখী — সই ; সহচরী।
সঙ্গীন — বন্দুকের মুখে লাগানো ছোরা ; সঙ্কটাপন্ন।
সটান — সোজা ; সরাসরি।
সন্দেহ — সংশয়।
সন্ধান — খোঁজ।
সবলে — সজোরে।
সবংশে — বংশের সবাই একসঙ্গে।
সভ্যতা — ভদ্র জীবনযাপন।
সমস্ত — সব ; সারা ; পুরো।
সমুদ্দুর — সমুদ্র ; সাগর।
সম্পত্তি — বিষয়-আশয়।
সম্পদ — ধনদৌলত।
সম্পাদক — যিনি পত্রিকার লেখা বাছাই করেন।
সম্বল — পুঁজি ; পাথেয়।
সরাসরি — সোজাসুজি।
সরোবর — হ্রদ ; জলাশয়।
সর্বত্র — সব জায়গায়।
সর্বনাশ —সব নষ্ট হওয়া ; মহাবিপদ।
সহচর — সঙ্গী ; সাথী।
সহানুভূতি — সমবেদনা ; দরদ।
সাইরেন — সঙ্কেতধ্বনি ; ভোঁ।
সাজগোজ — বেশভূষা।
সাড়াশব্দ — উত্তর ; শোরগোল ; চাঞ্চল্য।
সাথী — সঙ্গী।

সাধান — মিনতি করানো।
সাবাড় — শেষ ; ফুরানো।
সামলে — (১) সাবধান হয়ে ;
(২) সংবরণ ক'রে ।
সামান্য — কম ; অল্প।
সার — আসল ; যাতে উর্বরতা বাড়ে।
সারা — (১) সমস্ত; (২) শেষ; সম্পূর্ণ।
সারাই — মেরামতি।
সাহেব — শ্বেতাঙ্গ ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
সাঁঝ — সন্ধ্যা।
সিনসিনারি — রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপটে আঁকা দৃশ্যগুলি।
সিরাপ — চিনির রস দিয়ে তৈরি সরবৎ।
সীমানা — প্রান্ত ; চৌহদ্দি।
সীমান্ত — শেষ সীমা ; বর্ডার।
সুঁড়িপথ — খুব সরু পথ।
সুদূর — অনেক দূর।
সুদ্ধ — সমেত ; পর্যন্ত ; মাত্র।
সুনাম — সুখ্যাতি ; যশ।
সুবিধের — অনুকূল ; কাজের।
সুযোগ — ভালো যোগাযোগ ; ভালো সময় ; সুবিধা।
সুর্তি — পানের সঙ্গে খাওয়ার এক রকম তামাকের গুলি।
সূক্ষ্ম — সরু ; মিহি ; তীক্ষ্ণ।
সূর্যোদয় — সূর্য-ওঠা।
সৃষ্টি — তৈরি ; নির্মাণ; রচনা।
সেতার — বীণা জাতীয় তারের বাদ্য।
সেলাই — সূচীকর্ম।
সেলাম — ডান হাত কপালে তুলে নমস্কার।
সৌভাগ্য — ভালো ভাগ্য।
স্কন্ধ — কাঁধ।
স্কেটিং — বরফে বা সমান জায়গায় ছোটা বা গড়াবার জন্যে পায়ে বাঁধা এক রকমের লোহার নাল লাগানো পাদুকা।
স্ট্র — খড়ের বা কাগজের নল।
স্তন্য — বুকের দুধ।
স্তব্ধ — নিশ্চল ; নীরব।
স্তম্ভিত — নিশ্চল ; অবাক।
স্থির — নিশ্চল ; শান্ত।
স্পন্দন — চলন ; কম্পন ; ধুকপুক।
স্পর্শ — ছোঁয়া।
স্বপ্ন — ঘুমের মধ্যে দেখা।
স্বর্গ — দেবলোক।
স্বাধীনভাবে — নিজে নিজে ; কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে।

হতভাগা, হতভাগী — ভাগ্যহীন ; যার ভাগ্য খারাপ ; দুঃখী ; দুর্ভাগা।
হলকা — গরম হাওয়ার স্রোত।
হল্লা — চেঁচামেচি ; গোলমাল।
হাইতোলা — ঘুমে বা ক্লান্তিতে মুখ হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস ছাড়া।
হাড়-মাস কালি — শরীর পাত হওয়া।
হাতকাটা — যে জামার হাতা নেই।
হাত সাফাই — হাতের পটুত্ব ; চোখে ধুলো দেওয়া।

হাতিয়ার — অস্ত্রশস্ত্র ; যে সব যন্ত্র দিয়ে কাজ হয়।

হানা — আক্রমণ ; ছুঁড়ে মারা।

হামলা — আক্রমণ।

হাম্বানো — গরু যখন মরা বাছুরের শোকে ক্ষোভ জানাতে একটানা হাম্বা রব করে।

হামা — হাঁটু আর হাত দিয়ে চলা।

হিজিবিজি — আঁকাবাঁকা ; এলোমেলো।

হিতোপদেশ — ভালো উপদেশ।

হিরণ্যাক — সোনার রঙ।

হুইসেল — শিস দেওয়া বাঁশি।

হুল — মৌমাছি, বিছা ইত্যাদি ছুঁচের মতো যা ফোটায়।

হুল্লোড় — দল বেঁধে হল্লা আর ফুর্তি।

হেঁড়ে গলা — মোটা গলা।

হেথা — এখানে।

হেলিকপ্টার — মাথায় পাখা লাগানো বিমান।

কথার ঝুড়ি

১। তিন অক্ষরের কোন্ কথার—

পা ধরলে চিৎপটাং
    একেবারে হারো;
না যদি হা বলো তবে
    অবশ্যই পারো।
রা কেড়ো না, রা কাড়লে
    রয় না কথার মানেই;
পা আছে তার শুনলে, তবু
    মনে হবে পা নেই॥

২। এক কথায় সব প্রশ্নের জবাব দাও:

ক। কুঁড়েঘরের মাথায় কি তোলা হচ্ছে?

খ। হাঁড়িতে জল চড়িয়ে তাতে কি দেওয়া হল?

গ। পাইপ মুখে দেওয়া লোকটা কি মারছে?

৩। একই শব্দ দিয়ে প্রত্যেকটি ফাঁক পূরণ করো:

ক। এক গনৎকার রাস্তায়·········দেখছিল।

খ। গরমকালে আমি·········কাটা জামা পরি।

গ। ছোটদের গায়ে কখনো·········তুলো না।

ঘ। দুর্ঘটনা হঠাৎ ঘটে, তার পেছনে কারো······ছিল না।

ঙ। সবাই মিলে·········লাগালে ঠিক কাজ হবে।

উত্তর: ১। পাহারা; ২। চাল; ৩। হাত।

নিজে পড়ি

তৃতীয় পাঠ

এই তৃতীয় পাঠ 'নিজে পড়ি' তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী বাংলা পাঠ্যবই (reader)। এই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এরই পরিপূরক 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' তৃতীয় ভাগ বইটি প্রকাশিত হয়েছে, যেটি অনুশীলনী বা সহায়ক পুস্তক (workbook)। বই দু'খানি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে গোড়া থেকেই ছেলেমেয়েরা সহজে বাংলাভাষা পড়তে ও লিখতে শেখে—ছবি, ছড়া ও মজাদার নানা গল্পের সহায়তায় তারা এই ভাষা আয়ত্ত করতে উৎসাহ পায়।

এই পুস্তকমালার লেখিকা একজন অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষিকা এবং তিনি এই স্তরের আরো অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এর পরিকল্পনা করেছেন। তার ফলে এই পুস্তকগুলি বাংলা শেখার অন্যতম প্রধান ও সর্বাধুনিক পুস্তকমালা হয়ে উঠেছে।

প্রথম শ্রেণীর আগের স্তরে, অর্থাৎ প্রস্তুতি শ্রেণীর (Preparatory) জন্য কেবল 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' [প্রাথমিকা]-সহ এই পুস্তক-মালায় প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য দু'-খানি ক'রে (পাঠ্য ও অনুশীলনী) পুস্তক পরিকল্পিত হয়েছে। আকার ও আয়তন পৃথক হলেও প্রতিটি পুস্তক পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিক ও ক্রমাগ্রসর (graded) পদ্ধতিতে ও নিয়ন্ত্রিত শব্দসমষ্টি (controlled vocabulary) বজায় রেখে এগুলি রচিত হয়েছে।

বাংলা যাদের দ্বিতীয় ভাষা এবং বাংলা যাদের প্রথম বা মাতৃভাষা—উভয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই মাধ্যমিক স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষায় একই যোগসূত্রে মিলতে পারবে এই পুস্তকমালায়।

Bandyopadhyay Gita : NIJE PARI [Bengali, Reader III]
ISBN 0 86131 503 0
Rs. 13.00